লু শুন
সমাজ ও সাহিত্য

: পরিবেশক :
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫/২৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
শ্রীমাণিক চক্রবর্ত্তী
চন্দননগর
হুগলী।

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ :
শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবাদলচন্দ্র পাল
এস. এম. প্রিন্টিং
১৯ডি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

লু শুন জন্ম শতবর্ষে দিকে দিকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা পালন করছেন তাঁর জন্ম জয়ন্তী। আমাদেরও আকাঙ্খা হলো শ্রদ্ধাঞ্জলী দেয়ার।

বিশাল সেই সাহিত্যপুরুষের সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের পরিচয় ঘটানোর প্রচেষ্টাটাই হবে বোধ হয় উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলী—আমরা ভাবলাম এইরকম।

কিন্তু বিরাট যজ্ঞে যেমন উপযুক্ত পুরোহিত প্রয়োজন এক্ষেত্রেও তো তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাই আমাদের আকাঙ্খার কথা মহাশ্বেতাদিকে জানালাম। খুশি মনেই রাজী হয়ে গেলেন তিনি।

পাঠকের কাছে এই হলো বিনীত স্বীকারোক্তি, এই বই প্রকাশের।

শ্রদ্ধেয় অভিনন্দনান্তে—

মাণিক চক্রবর্তী

চন্দননগর, হুগলী

ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলনের
কর্মীদের উদ্দেশে

এক ॥

চীনের নতুন জাতীয় সংস্কৃতির পথের পুরোধা পুরুষ ছিলেন লু শুন। দেশের সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার আক্রমণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিরোধে তাঁর আমরণ সংগ্রাম সারা দুনিয়ার গণমুখী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, শুধু চীনের নতুন সংস্কৃতিক্ষেত্রেই নয়, চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে তিনি তাঁর লেখক জীবনকে পুরোপুরি মেলাতে পেরেছিলেন। জনগণের সঙ্গে তিনি সদাই হাজির। কখনো তাদের সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন, কখনো বা প্রেরণা যোগাচ্ছেন। সর্বদাই তিনি চীনের মানুষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি। এমনি করে মুখের কথা, লেখার বক্তব্য আর ব্যক্তিজীবন, তিনটেতে কোনো তফাত রাখেননি বলে চীনের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সাহসী, দৃঢ়চিত্ত, সঠিক ও দীপ্যমান জাতীয় বীর। সাধারণ জনগণ জানত লু শুন তাদের সঙ্গে আছেন, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতি কর্মীরা জানত লু শুন তাদের সঙ্গী। চীনের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে তিনি এমন করে এক হয়ে আছেন যে তাঁর জীবনের ও সাহিত্যের ইতিহাসকে দেশের ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখা চলে না।

১৮৮১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর চোকিয়াং প্রদেশের শাও-শিংয়ে যে শিশুটি জন্মান, তাঁর নাম ছিল চৌ সু-জেন। লেখক জীবন শুরু করার কালে তিনি "লু শুন" নাম নেন। যে পরিবারে জন্মালেন সে পরিবার বিদ্বান বলে বেশ নামডাক ছিল। তাঁর ঠাকুর্দা পিকিংয়ে

রাজকর্মচারী ছিলেন। তবে বেশিদিন তিনি সসম্মানে চাকরি করতে পারলেন না আর লু শুনের ১৩ বছর বয়সে তাঁকে জেলে যেতে হল। তাঁর জেলে যাবার ধাক্কা লু শুনের পরিবার কোনদিন আর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। লু শুনের বাবাও বেশ বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনো কোনো সরকারী চাকরি পাননি। পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তাঁকে নানারকম কাজকর্ম করতে হয়। পরিবার তো খুবই গরীব হয়ে পড়ে। তারপর লু শুন যখন কিশোর, তখনি তিনি পড়লেন রোগশয্যায়। সেই যে বিছানা নিলেন, তিন বছর শুয়েই রইলেন তিনি, মৃত্যু অবধি। লু শুনের পরিবারকে সে সময়ে ভীষণ দারিদ্র্যে কাটাতে হয়। এই দুঃখ ও সংকটের সময়ে লু শুনের মা হাল ধরলেন। তিনি এক মফঃস্বলের শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। নিজের চেষ্টায় তিনি লিখতে পড়তে শেখেন। কুমারী জীবনে তাঁর নাম ছিল লু। এই নাম থেকে পরে লু শুন তাঁর লেখক-নাম নেন। মায়ের প্রেরণা তাঁকে সারাজীবন উৎসাহ দিয়েছে।

ছয় বছর বয়সে লু শুন স্কুলে ভর্তি হলেন। এই সময় থেকেই তাঁর হাতে খড়ি হল চীনের ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠে। এমনি করে, লেখাপড়া শেখার গোড়াতেই তিনি পরিচয় শুরু করলেন দেশের সামন্তবাদী চিন্তাধারার সঙ্গেও। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শাওশিংয়ে থাকলেন। এই ১৭ বছরের ১২ বছর ধরে তিনি চীনের ধ্রুপদী সাহিত্য একটানা পড়েন। যা পড়লেন, তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা তিনি অনেক আলোচনার মধ্যে লিখেছেন। সামন্তবাদী পিতৃতন্ত্রী সমাজের প্রাচীন নীতিবাদ ও প্রচলিত দৃষ্টি ভঙ্গিকে তিনি এই সব ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি যে সময়ে এ সব করেন, সে সময়ে এমন চ্যালেঞ্জ জানানো মানে বিদ্রোহ করা। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সাহিত্য, যে নীতিবাদী শিক্ষা, তাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মত মনোবল তখনি লু শুন অর্জন করেছেন। প্রাচীন ও রক্ষণশীল ধ্রুপদী সাহিত্য এবং ইতিহাস ছাড়া পুরাকথা, বেসরকারী

ইতিহাস, নানা প্রবন্ধ, গল্প, কিংবদন্তী, এ সবে তাঁর আগ্রহ ছিল খুব। সামন্তবাদী নীতিবাদ কি, তা তিনি জেনেছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ে। পুরাকথা, বেসরকারী ইতিহাস, এ সব পড়ে তিনি দেশকাল সম্পর্কে প্রকৃত সত্য কি তা চিনতে জানতে শেখেন। সব চেয়ে বড় কথা হল, গ্রামের কৃষক পরিবারগুলির সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে বড় হলেন বলে জীবনটাকে দেখার চোখই তাঁর বদলে গেল। খোলা চোখে জীবনটা দেখতে শিখলেন, পুঁথিগত বিদ্যা সম্বল করে চশমা পরে জীবনটা দেখলেন না। সামন্তবাদী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ লোকের জীবন সংগ্রামের দ্বন্দ্বটা তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেল।

বনে তো কত গাছই থাকে। এক একটা গাছ সতেজ, মাথা উঁচু, দেখলে বুঝি যে হ্যাঁ, ইনি হলেন বনস্পতি। সে গাছটা মাটিতে শিকড় চালিয়ে আর ডালপালা পাতা মেলে সূর্যকিরণকে বন্দী করে ঠিকমতো রসদ নিয়ে বড় হয়েছে বলেই সে বনের সম্রাট। লু শুনও দেশ ও মানুষের মধ্য থেকে রসদ নিয়ে মন, দেখার চোখ, বুঝবার ক্ষমতা সব তৈরি করেছিলেন বলেই তিনি লু শুন হতে পেরেছিলেন। যুবক হবার পর বই পড়ে "দেশ ও মানুষ দুঃখে আছে" জেনে জনগণের জন্য সংগ্রাম করতে যাননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেশ ও মানুষ কি অবস্থায় আছে তা জেনেছিলেন। তাই সময় হলে জনগণের সংগ্রামে সাথের সাথী হওয়াটা তাঁর ক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

নিজের গল্প সংকলন "অস্ত্রের ডাক"—এর ভূমিকায় লু শুন নিজেই তাঁর ছেলেবেলার কথা বলেছেন। সে সময়ে দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে সত্যকে চেনার কথাও বলেছেন, "চার বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে প্রায় রোজই আমি একটা বন্ধকী দোকান ও ওষুধের দোকানে যেতাম। তখন যে কত বড় হয়েছি তা সঠিক মনে নেই। তবে ওষুধের দোকানের কাউন্টারটা আমার মাথা সমান উঁচু ছিল, বন্ধকী দোকানের কাউন্টারটা আমার দ্বিগুণ উঁচু। সেই দ্বিগুণ উঁচু কাউন্টারে

আমি পোশাক আশাক আর টুকটাক শৌখিন জিনিস রাখতাম, তাচ্ছিল্যভরে যে পয়সা দেয়া হত তা নিতাম। তারপর আমার মাথা সমান উঁচু কাউণ্টারে যেতাম বাবার জন্যে ওষুধ কিনতে। বাবা অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। বাড়িতে ফিরলেও অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। কেন না যেহেতু যিনি বাবার ব্যবস্থাপত্র লিখতেন সে ডাক্তার খুব নামকরা, সেহেতু তিনি দুষ্প্রাপ্য সব ওষুধের নাম লিখতেন। যেমন, শীতকালে মাটি খুঁড়ে তোলা ঘৃতকুমারী গাছের শিকড়, তিন বছর হিম খেয়েছে এমন আখ, যমজ ঝিঁঝিপোকা, আডিশিয়া,······এ সব জোগাড় করা ভারি কঠিন। কিন্তু বাবার অসুখের গতিক খারাপ হতেই থাকল, যদ্দিন না তিনি মারা গেলেন। আমার বিশ্বাস, যারা ঐশ্বর্যবান সমৃদ্ধ অবস্থা থেকে দারিদ্র্যে পতিত হয় ক্রমে, তারা হয়তো সে সময়ে বুঝতে পারে যে দুনিয়ার আসল চেহারাটা কি রকম।”

ছেলেবেলা থেকেই লু শুন দেশের লোকশিল্পকে ভালবেসেছেন। নববর্ষের ছবি, লোককথা, উপকথা, গ্রামীন অপেরা, এ সবের সঙ্গে এ সময় থেকেই তাঁর গভীর পরিচয় আর ভালবাসা। ছবির বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা তো সকলেই জানেন। খুব আগ্রহ করে তিনি জোগাড় করতেন অ্যালবাম, সচিত্র বই, কাঠ খোদাই ছবি। গ্রামীন শিল্পীদের তৈরি কাঠখোদাই ছবি তাঁকে শৈশবে যথেষ্টই প্রেরণা দিয়েছে। পরে যখন তিনি নামকরা মানুষ হলেন, তখন প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন কাঠ-খোদাই ছবির ব্যাপারটিকে আধুনিক করে তুলতে, নতুন চেতনা জাগিয়ে তার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করতে। আজ চীনে কাঠখোদাই শিল্পের আলোচনা করতে হলে লু শুনকে বাদ দেবার উপায় নেই।

গ্রামীণ পরিবেশ ও স্বদেশ চীনকে লু শুন কৈশোর থেকেই ভালবাসলেন। চাষী পরিবারের সন্তানরা তাঁর বন্ধু, দেশের লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর মমতা। ফলে দেশের ওপর, জনগণের ওপর তাঁর গভীর আস্থা। বিশ্বাসের মাটি ছেড়ে লু শুন কখনো সরে যান নি। এর ফলে আমরা দেখি লু শুন বিদেশে থাকলেন, অন্য দেশের সাহিত্য-

শিল্পের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, কিন্তু কখনোই তাঁর মনের মূল দেশের মাটি থেকে উপড়ে গেল না। সব অভিজ্ঞতাকে দেশের ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কাজে লাগালেন, সে সব অভিজ্ঞতাকে দেশের সাহিত্য-শিল্পের সমৃদ্ধির কাজে লাগালেন।

দেশ ও মানুষের সঙ্গে একপ্রাণ ছিলেন বলে লু শুন সঠিক পথ চিনতে কখনো ভুল করেন নি। সঠিক পথেই তিনি হেঁটেছেন আর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পথ মিলেছে বিপ্লবের পথে, এ কথা আগেই বলেছি। পরবর্ত্তীকালে ট্রটস্কিপন্থীরা, দলে টানবার জন্য তাঁকে নানা প্রলোভন দেখায় ও চিঠি লেখে। জবাবে লু শুন বড় চমৎকার কথা লিখলেন, "আপনাদের "তত্ত্ব" নিশ্চয় মাও ৎসে-তুঙের তত্ত্বের চাইতে অনেক উচ্চমার্গের; আপনাদেরটা আকাশচারী আর মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারা মৃত্তিকাস্পর্শী।......আমি এমন সব মানুষকে কমরেড হিসেবে পাওয়া গর্বের কথা বলেই ধরি, যাঁরা এখন দারুণ কাজ করছেন, দৃঢ় পদক্ষেপে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, লড়াই করছেন এবং চীনা জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য নিজেদের রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন।"

তাঁর জন্মস্থান শাওশিং তুলনামূলক ভাবে খানিকটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় ছিল। তাই দেশের সাধারণ সামাজিক সমস্যা ও বিপদ, শাওশিংয়ের জীবনকে খুব একটা নাড়া দেয়নি। লু শুনের বিত্তবান পরিবারের অবস্থা তবু যে পড়ে গেল, তার কারণ পাওয়া যাবে দেশের সামন্তবাদী শাসনব্যবস্থার নড়বড়ে অবস্থায় এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সমস্ত কুফলে। এ সব ব্যাপার লু শুনের জীবনে খুব ছাপ রেখে যায়। তিনি কিশোর বয়সেই বুঝেছিলেন, দেশের মুমূর্ষু অবস্থার জন্য দায়ী হল দেশের সামন্তবাদী শাসনব্যবস্থা আর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। ১৩-১৭ বছর বয়সের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কঠোর জীবনসংগ্রামকেও তাঁর ভালো করে চেনা হয়ে যায় বাবা অসুখে পড়ে থাকার সময়টিতে। সামন্তবাদী শাসনব্যবস্থা আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ব্যবস্থার চেহারাও তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে যায়।

লু শুনের জীবনের বাল্যকাল ও কৈশোরে চীনের সামাজিক ও আর্থনীতিক ইতিহাসটা জানা খুব দরকার। এই সমগ্র ব্যবস্থার প্রতিফলন লু শুনের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে, কি হবে কাজের পথ, তা এর ফলেই ঠিক হয়ে যায়।

লু শুন জন্মাবার ৭ বছর আগে ১৮৭৪ সালে জাপান চীনের তাইওয়ান অধিকার করে বসল আমেরিকান সামরিক অফিসারদের সহায়তায়। দেশের সেনাবাহিনী ও জনগণ, তাইওয়ান অধিকারের বিরুদ্ধে জোর লড়াই শুরু করল। তখন আমেরিকা এগিয়ে এল মধ্যস্থতা করতে। মাঞ্চু সরকারকে ৫০০,০০০ তাল (বাংলা ১৩২৩ সালে ৭২ তাল=১০০ ডলার) রূপা ক্ষতিপূরণ দিতে হল জাপান তার সেনাবাহিনী উঠিয়ে নেবার চুক্তির দাম স্বরূপ। ওদিকে আগে বর্মা অধিকার করে তারপর বৃটিশ ঢুকে পড়ল য়ুনানে। ১৮৭৫ সালে এই য়ুনানেই নিহত হল বৃটিশ অফিসার আর. এ. মাগারি। এর সুযোগ নিয়ে বৃটিশ মাঞ্চু শাসকদের কাছে দাবী করে বসল বর্মার পথে এই অঞ্চলে একটি বাণিজ্য-সড়ক। ফলে ১৮৭৬ সালে বৃটেন ও চীনের মধ্যে এক চুক্তি সই হল চীফো সম্মেলনে। এই চুক্তির ফলে য়ুনান, তিব্বত, কাংশু আর চিংহাইতে বৃটেনকে কাজকর্ম চালাবার অধিকার দিতে হল।

উনিশ শতকের শেষ দিকেই তিব্বতের ওপর বৃটেনের নজর পড়ে। তিব্বতে বৃটেনের বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধে দেখার জন্য বৃটেন ১৮৭৩ সালেই এক প্রতিনিধি দল পাঠায়। চীফো-চুক্তি সই হল যখন, তখন সেই সুযোগে বৃটেন দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে অবাধে কাজকর্ম চালাবার সুযোগও পেয়ে গেল। ওই অঞ্চলের খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে এক বৃটিশ দলকে পাঠাবার অনুমতি দাবী করে বসল বৃটেন। তিব্বতের মানুষরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে বৃটেন ভয় দেখাল যে সে তিব্বত আক্রমণ করবে। এ হুমকিতে তিব্বতী জনগণ মোটেই ভয় পেলেন না। তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। আর

মাঞ্চু সরকার ঘাবড়ে গেল তিব্বতীদের প্রতিরোধ দেখে। সে বৃটিশ আক্রমণ কারীদের সমর্থন জানাতে থাকল। তাতেও কিন্তু তিব্বতে ঢোকার আশা বৃটেনের পূর্ণ হল না।

আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্স ভিয়েতনাম জয় শুরু করে এবং এখান থেকেই য়ুনান ও কোয়াংশি প্রদেশের ওপর আক্রমণ শুরু করে। এ থেকেই শুরু হয়ে গেল চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৮৪-৮৫)। লিউ উঙ-ফুর নেতৃত্বাধীন "কালোপতাকা" স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাতে ফরাসী আগ্রসনকারীরা বার বারই যুদ্ধে হেরে যেতে থাকে। তাইপিং বিপ্লবের সময়কার কৃষক-যোদ্ধাবাহিনী, কুয়াংটুং এবং কোয়াংসি সীমানায় তৈরি হয়ে হাজির ছিল। ফরাসী আগ্রাসনকারী বনাম ভিয়েতনামের এ লড়াইয়ে তারা ভিয়েতনামীদের সমর্থন ও সাহায্য করে। অবশেষে চেন্নান কুয়ানের যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী চূড়ান্ত ভাবে বিপর্যস্ত হয়।

সেনাবাহিনী, কৃষকযোদ্ধা সংগ্রাম করে চলতে রাজী। তাহলে কি হবে। শান্তির জন্যে অধিক উৎসাহে মাঞ্চু সরকার ফরাসীদের সঙ্গে এক চুক্তি করে বসল। ১৮৮৫ সালে তিয়েনৎসিনে এই শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করা হল। এই চুক্তির ফলে (১) ইন্দোচীনে ফ্রান্সের অভিভাবকত্ব মেনে নিল চীন ; (২) চীনে রেলপথ নির্মাণে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করতে হয়। এই চুক্তি এবং ১৮৭৬ সালের চীফো চুক্তি, দুয়ের ফলে চীন বাধ্য হয় দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের রাস্তা বিদেশীদের সামনে খুলে দিতে।

এদিকে ১৮৮০-র পরে চীনের জাতীয় পুঁজিপতিদের খানিক সমৃদ্ধি দেখা গেল। সরকারী কলকারখানার পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানার শিল্পোদ্যোগ বাড়তে থাকল। তবে সবই পরিচালিত হল সরকারী তত্ত্বাবধানে। লু শুনের জন্ম বছরে ১৮৮১ সালে ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানা ও খনির সংখ্যা ছিল চার। ১৮৮৫ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় উনসত্তর—এ। এই চার বছরে ব্যক্তি-শিল্প পুঁজির পরিমাণ ৩,৩,০০০০ ডলার থেকে ৮,৫৩,০০০০ ডলারে দাঁড়ায়। বস্ত্রশিল্পে

অগ্রগতি তাড়াতাড়ি ঘটল। কয়লা খনির ক্ষেত্রেও তাই। এই দুই ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী মোট মূলধন ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে বাইশ গুণ বেড়ে যায়।

কোরিয়া ও চীনের মৈত্রী বহুদিনের। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ঐক্য এবং দুই দেশের কিছু স্বার্থ এক থাকাই তার কারণ। জাপান তখন এক সাম্রাজ্য সম্প্রসারণবাদী দেশ। মার্কিণী সহযোগিতায় জাপান কোরিয়ার ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ফলে কোরিয়ার জনগণ, দেশের সামন্ততান্ত্রিক সরকার আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, উভয়ের শিকার হলেন। ১৮৯৪ সালে তাঁরা তংহাক বা "ইসটার্ন ডকট্রিন"-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। কোরিয়া সরকার এ বিদ্রোহ দমনের জন্যে চীনের মাঞ্চু সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। উত্তর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে অনুরোধ জানায়। এই সুযোগে জাপান দক্ষিণে সেনাসমাবেশ করল।

তংহাক বিদ্রোহ দমন হল। মাঞ্চু সরকার দাবী করল যে কোরিয়া থেকে জাপানী সেনা ওঠাতে হবে। জাপান সে দাবীকে কোনো গুরুত্বই দিল না। বরং বলে বসল যে কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজনেই জাপানী সেনা এসেছে। কোরিয়ার সিউলে জাপান সেনা মোতায়েন রেখে কোরিয়ার সমস্যাকে আরোই জটিল করে তুলল।

এরমধ্যেই, আধুনিকী করণের নামে চীনে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা হতে থাকল। এই কাজে লি হুং-চাংয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশা করছিলেন যে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করলে চীনের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়বে। ফলে, জাপান যখন চীন ও কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিচ্ছে, তখন লি, চীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার কথা ভাবলেন না। তিনি পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবতে লাগলেন। লি, বৃটিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, বৃটেন যেন জাপানকে কোরিয়া আক্রমণে বিরত থাকতে পরামর্শ দেয়। পরে রুশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, রাশিয়া যেন জাপান ও

কোরিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতা করে। লি হুং-চাংয়ের এই রকম নীতির ফলে মাঞ্চু সরকার যুদ্ধ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ল।

জাপান এ সুযোগ হারাল না। সে যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। তারপর, যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে সিউলের দক্ষিণে চীনা নৌ ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল।

দুই মাস পরে পাইয়ংইয়াংয়ের উপকণ্ঠে চীনের এক শক্ত ঘাঁটি দখল করল জাপান। মাঞ্চু বাহিনী পাইয়ংইয়াং-এ খুব সাহসের সঙ্গে লড়ল বটে, কিন্তু জিততে পারল না। এই যুদ্ধের পরই পীত সাগরে তাতুংকৌয়ের নৌ-যুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধে জাপান এক শয়তানী কৌশল অবলম্বন করে। চীনের উপকূলে আসার সময়ে জাপানী জাহাজগুলিতে মার্কিনী পতাকা উড়িয়ে দেয়। উপকূলে পৌঁছে তারা হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে। ১৮৯৫ সালে জাপানী নৌ-বহর শানটুং-এর ওয়েইহাইওয়েই-এর দরজায় পৌঁছে গেল। চীনা নৌ-বাহিনীর এক বিরাট অংশ এর প্রতিরোধে এগিয়ে এল। কিন্তু লি হুং-চাং-এর বিশেষ নির্দেশে অ্যাডমিরাল তিং জু-চাং হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করতে অ্যাডমিরাল তিং রাজী ছিলেন না। তাই আত্মহত্যা করে তিনি অপমানের হাত থেকে বাঁচলেন। এদিকে "বৈদেশিক" পরামর্শদাতাদের চাপে লি হুং-চাং এক অপমানজনক পরাজয় মেনে নিলেন।

যুদ্ধ যখন চলছিল, তখন মাঞ্চু সরকার সে সময়টা যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি খুঁজছিল। মধ্যস্থতা করার জন্য তারা বারবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। মার্কিন সরকার সে অনুরোধে কানও দেয়নি। মাঞ্চু স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী হেরে যাবার পর এখন মাঞ্চু সরকার আবার মার্কিন সরকারের কাছে আবেদন জানাল। এখন আমেরিকা বুঝল যে চীনে বেশিদিন যদি যুদ্ধ চলে, সেই সুযোগে অন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে ঢুকে পড়তে পারে। তা যদি

ঘটে, তাহলে আমেরিকার আগ্রাসনবাদী স্বার্থ চোট খাবে। ফলে আমেরিকা জাপানকে যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ জানায়। জাপান তাতে রাজী হয়। ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে লি হুং-চাং তাঁর মার্কিন পরামর্শ-দাতাকে সঙ্গে নিয়ে জাপানের সিমোনস্কিতে হাজির হলেন। এখানে তাঁকে যে অপমানজনক চুক্তিতে সই করতে হল সে সন্ধির ফলে চীন কোরিয়ার ওপরে সমস্ত আধিপত্য হারাল, কোরিয়ার ওপর জাপানের আধিপত্য তাকে মেনে নিতে হল। এ ছাড়া চীনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হল ২০০ মিলিয়ন তাল রূপা ; শাসি, চুংকিং, সুচৌ এবং হাংচৌতে জাপানকে বাণিজ্যের অধিকার ও চীনের মাটিতে কারখানা গড়ার অধিকার দিতে হল।

চীনে, জাপানকে কারখানা গড়ার অধিকার আর অন্যান্য বিদেশী শক্তিকে বিশেষ সুযোগ দান একটি প্রসঙ্গকে বিশেষ তাৎপর্য দেয়। তা হোল মাল রপ্তানির বদলে মূলধন রপ্তানি শুরু হোল। এটিকে উনিশ শতকের শেষাংশে বিশ্বপুঁজিতন্ত্রের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণের গতি হল পুঁজিবাদের সীমা ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের দিকে এগোনোর গতি। ১৮৯৪ সালে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন জাপানে পুঁজিবাদের উন্নততর রূপ বেশ স্পষ্ট। তাই এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে চীনে বিদেশী পুঁজি মোটা রকম আমদানি হল। ফলে চীন এক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হল। চীনে বিদেশী কারখানাগুলি চীনা শিল্পোদ্যোগের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পেত। রাজনৈতিক ভাবে সুযোগ পেত, তার ওপর তাদের হাতে পুঁজি ছিল অনেক বেশি। তাদের তৈরি জিনিষের দাম তুলনায় কম ছিল। কেন না তারা কাঁচা মাল কিনত সস্তায়, মজুরদের খাটাতো কম পয়সায়।

এদিকে সিমোনস্কি চুক্তির ফলে লিয়াওতুং উপদ্বীপটি জাপানের হাতে চলে যাওয়ার ফলে এক সঙ্গে জারের রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানী

ক্ষেপে গেল। জার শাসিত রাশিয়ার অনেকদিনের লোভ উত্তর-পূর্ব চীনের ওপর। ফ্রান্স সে সময়ে রাশিয়ার বন্ধু। তার পক্ষেও জাপানের তাইওয়ান ও পেংগু দ্বীপ দখল ভাল চোখে দেখা অসম্ভব। কেন না জাপান আগেভাগে দখল নিয়ে রাখলে ফ্রান্স কি করে তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে? জার্মানী তো বরাবরই দূর প্রাচ্যের ওপর নজর রেখেছে। ফলে একই স্বার্থের কারণে রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানী একজোট হল আর ১৮৯৫ সালের এপ্রিলে টোকিওকে হুমকি দিয়ে বলল, জাপান যেন অবিলম্বে লিয়াওতুং উপদ্বীপটি চীনকে ফিরিয়ে দেয়। জাপানকে ভয় দেখাবার জন্যে শানটুং-এর কাছাকাছি অঞ্চলে রাশিয়া তার নৌ-বহর সাজাল। জাপান ঘাবড়ে গেল ও চীনের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে লিয়াওতুং ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

মাঞ্চু শাসনের শুরু থেকেই তাইওয়ান ছিল অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগামী। আফিম যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে বিদেশী অর্থনীতির অনুপ্রবেশ তাইওয়ানে অনেক পরিবর্তন আনে। তাইওয়ানের বাজার বিদেশী সুতির কাপড়ে ও খাদ্যশস্যে ছেয়ে যায়। ফলে চীনের উৎপন্ন চালের দাম অনেক পড়ে যায়। অনেক কম দামে দিলেও তা প্রায়ই বিক্রি হত না। তার ওপর অঢেল আফিম আমদানি তো ছিলই। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান খুব নিম্নস্তরে নেমে যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তপোক্ত করবার জন্যে এই সময়ে মাঞ্চু সরকার তাইওয়ানকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলে ঘোষণা করে, সেখানে টেলিগ্রাফ লাইন বসে, দুটি রেলপথ তৈরি হয়। তাইওয়ানের জনগণের মধ্যে বিপ্লবের একটা ঐতিহ্য ছিল। ১৮৬২ সালে তাঁরা মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন তাইপিং বিপ্লবের প্রভাবে। এই বিদ্রোহে ২,০০,০০০-র বেশি বিদ্রোহী অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় তিন বছর লড়াই করে তাঁরা মাঞ্চু শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের

অভিজ্ঞতাও তাঁদের ছিল। সিমোনস্কি চুক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে তাঁরাও সামিল হয়েছিলেন।

এই ১৮৯৫ সালের মে মাসে জাপান কীলাংয়ে নেমে পড়ে ও জুন মাসে তাইপে অধিকার করে। এখন লিউ য়ুং-ফুর নেতৃত্বে "কালো পতাকা" বাহিনী এক ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সংগ্রাম চালায় তাইওয়ানে। জাপানী আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তাঁরা রুখতে পারেন নি। তবু জনগণের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী সেনাদল অনেক জাপানী হামলাকে বাধা দেন। তাচিয়া নদীর কাছে তাঁরা অসম সাহসে লড়েন ও জাপানী হানাদাররা অনেকে নিহত হয়, অনেকে নদীর জলে ভেসে যায়। অন্য ঘুর পথে অনেক জাপানী সেনা এনে তবে "কালো পতাকা" দের হারানো যায়। এ সময়ে মাঞ্চু সরকার তাইওয়ানের প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সহায়তা বন্ধ তো করেই, উপরন্তু চীনের মূল ভূখণ্ডের লোকদের নিষেধ করে দেয় তাদেরকে সাহায্য করতে। কারো সাহায্যই পায় না তাইওয়ানের যোদ্ধারা। ফলে ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে তাইনানও জাপানী অধিকারে চলে যায়।

চীন-জাপান যুদ্ধের কিছু আগে থেকে কিছু পর পর্যন্ত বৃটেন, ফ্রান্স জার্মানী জাপান, আমেরিকা এবং রাশিয়া একযোগে চীনে মূলধন রপ্তানি করছিল, চীনে নিজেদের ব্যাঙ্কও তারা বসিয়েছিল। এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি চীনে পশ্চিমী ব্যাঙ্কপ্রথা চালু করে আর নিজেদের ব্যাঙ্কনোট বাজারে ছাড়তে থাকে। এমনি করে এই ব্যাঙ্কগুলিই হয়ে উঠল চীনে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

চীন-জাপান যুদ্ধ হয়ে গেল। এখন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মাঞ্চু সরকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে কিছু ঋণের জন্য আবেদন করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্বল দেশকে ঋণ দেওয়া মানেই হোল নিজের মূলধনের নতুন বাজার গড়ে তোলার মওকা। ঋণ দানের মাধ্যমেই নিজেদের খুঁটি চীন দেশে শক্ত করা যাবে। ১৮৯৪-৯৯ সালের মধ্যে তারা মাঞ্চু সরকারকে ৩৭০

মিলিয়ন তাল রূপা ঋণ দেয়। সে সময়ে দেশীয় সূত্র থেকে মাঞ্চু সরকারের যা আয় হত, এ ঋণের অঙ্ক সে আয়ের সাড়ে চার গুণ বেশি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কখনো নিঃস্বার্থভাবে ঋণ বা সহায়তা দেয় না। এই ঋণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা জামিন হিসাবে দাবী করে বাণিজ্য শুল্ক এবং লবণ থেকে আয়ের পুরোটা। এর ফলে চীনের অর্থনীতির ওপর তাদের মুঠো আরোই শক্ত হয়ে চেপে বসল। ঋণের মাধ্যমে চীনের মাটিতে অধিক সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আদায়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

১৮৯৫-৯৬ সালের মধ্যে সাংহাইয়ে বিদেশী পুঁজিবাদ যে কলকারখানা নির্মাণ করে। তার মধ্যে প্রধানত ছিল :

বৃটেনের তৈরি দুটি কাপড়ের মিল ও একটি ময়দা কল
আমেরিকার „ একটি সূতী কাপড় মিল
জার্মানীর „ „ „ „
জাপানের „ „ „ „ ও একটি ময়দা কল।

এ সব কলকারখানা বসাবার ও চালু করার সময়ে বিদেশী পুঁজিবাদ যে সব সুযোগ সুবিধা পায় মাঞ্চু সরকারের কাছে, দেশের উঠতি পুঁজিপতিরা তার কিছুই পায়নি। বিদেশী পুঁজিপতিরা পেল :

বিশেষ সুযোগ সুবিধা,
কাঁচা মাল তারা কিনল সস্তায়,

মজুরকে খাটাল সস্তা মজুরিতে। ফলে তারা যে অনুপাতে মুনাফা বাড়িয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল, ততখানিই মার খেতে থাকল দেশীয় পুঁজিপতিরা।

রেল পথ স্থাপনের আসল উদ্দেশ্য চিরকালই এক। যে দেশের মাটিতে রেলপথ বসবে সে দেশকে ভালো মত শোষণ করা। চীনের মাটিতে ব্যাঙ্ক, কলকারখানা বসাবার পরই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি শোষণের প্রয়োজনে চীনে রেলপথ বসাবার দরকারটা বুঝল। মাঞ্চু

সরকারকে চাপ দিয়ে তারা রেলপথ বসাবার অধিকার আদায় করে নিল। তারপর একসঙ্গে রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানী চীনের বুকে বিভিন্ন রেলপথ বসাতে লেগে গেল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের খনিজ সম্পদের দখল নিতে কিছুমাত্র দেরি করেনি। রাশিয়া ফুশান কয়লা খনির, বৃটেন কাইলুন কয়লাখনির এবং জাপান তাইয়ে লৌহ খনির উন্নয়নের অধিকার মাঞ্চু সরকারের কাছে আদায় করে নেয়।

সিমোনাস্কি চুক্তি সই হবার পর, চীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলার আগে চীনের মাটিতে "এলাকার ইজারা" ও "প্রতিপত্তির অঞ্চল" কায়েম করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। জাপানের হাত থেকে লিআওতুং উপদ্বীপ যারা চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে, যেহেতু তাদের মধ্যে ফ্রান্সও ছিল, সেহেতু ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ হিসাবে য়ুনান, কুয়াংতুং ও কোয়াংসি অঞ্চলের খনিগুলির ওপর কর্তৃত্ব দাবী করে। এতেও যথেষ্ট হয় না। ১৮৯৭ সালে তারা মাঞ্চু সরকারকে এই মর্মে চুক্তি করতে চাপ দেয় যে হেইনান দ্বীপে ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে প্রভুত্ব করতে দেওয়া হবে না। পরের বছরই কোয়াংচৌ উপসাগরটি ইজারা নেয় ফ্রান্স।

১৮৯৭ সালে বৃটেন মাঞ্চু সরকারকে বাধ্য করে য়ুনানের ইয়েহ্জেন পাহাড়ের একাংশ ছেড়ে দিতে, আর পশ্চিম নদীকূলে বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে উচৌ ও শামস্থইকে খুলে দেয়। পরের বছর বৃটেন কেড়ে নেয় ওয়েইহাইওয়েই বন্দর, কৌলুন উপসাগর, হংকং দ্বীপমালা এবং তাইপাং ও মুমচুম উপসাগর দুটি।

সে বছরেই জার্মানী দখল করে শানটুং উপকূলে কিয়াওচৌ উপসাগর আর পরের বছরে, কিয়াওচৌ উপসাগর-চুক্তি সম্পূর্ণ করতে মাঞ্চু সরকারকে চাপ দেয়। এই চুক্তি অনুসারে নৌবন্দর হিসেবে কিয়াওচৌ উপসাগরটি জার্মানীকে ইজারা দেয়া হয়। কিয়াওচৌ-ৎসিনাম রেলপথ নির্মাণের ও রেলপথের দুই পাশে দশ মাইল জমিতে খনি উন্নয়নের অধিকারও এই চুক্তির অংশ।

জারতন্ত্রী রাশিয়াও আসরে নেমে পড়ে। হেইলুংকিয়াং ও কিরিন থেকে ভ্লাডিভস্টক অবধি রেলপথ তৈরির দাবী জানায় ও দাবীটি মানিয়ে ছাড়ে রাশিয়া। ১৮৯৭ সালে রাশিয়া লুশুন ও তালিয়েন কেড়ে নেয়। পরের বছর রাশিয়া মাঞ্চু সরকারকে বাধ্য করে এক চুক্তি সই করতে। তাতে বলা হয় যে রাশিয়া যে দুটি জায়গার ইজারা নিয়ে রেখেছে, সে দুটিকে ছেড়ে দিতে হবে। এখন সেগুলি হবে যথাক্রমে নৌবন্দর ও বাণিজ্যিক বন্দর।

এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ঠিক করল, প্রত্যেকে প্রত্যেকের দখল মেনে নেওয়া দরকার। সকলেই তো এক স্বার্থ এক মন হয়ে চীনকে ছিন্নভিন্ন করছি। নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাঁধা ঠিক নয়। পরের নাক কাটলে নিজের যাত্রাভঙ্গ হতে পারে। তাই ইঙ্গ-ফরাসী, ইঙ্গ-জার্মানী ও ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষর হল। বৃটেন ও ফ্রান্স শ্‌ঝেচুয়ান ও য়ুনানে সব ব্যাপারে সমান অংশীদার হল। জার্মানী রেলপথ বসাবে তিয়েনৎশিন থেকে দক্ষিণ শানটুং অবধি। বৃটেন দক্ষিণ শানটুং থেকে কিয়াংসু অঞ্চলের চিনকিয়াং অবধি রেলপথ বসাবে। বৃটেনের অধীনে আসবে ইয়াংৎসে উপত্যকা আর রাশিয়ার হেফাজতে চীনের মহা প্রাচীরের উত্তরাঞ্চল। ওদিকে জাপান চাপ দিতে থাকল, মাঞ্চু সরকার যেন ঘোষণা করে যে ফুকিয়েন কোনো শক্তির হাতে যাবে না। জাপান দখল করে নেয় ফুকিয়েন।

প্রচুর বিদেশী টাকার লগ্নী, "ইজারাভুক্ত অঞ্চল"গুলি ছিনিয়ে নেয়া, দেশকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আওতায় টুকরো করে বিলানো, সবকিছু মিলেমিশে চীনের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসকদের গোলাম বানাল। অসীম ঔদ্ধত্যে চীনের সার্বভৌমত্বে হানা দেয়া হল। চীনের জাতীয় সংকট আসন্ন হল।

ওদিকে ১৮৬০ সালের গৃহযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিণ পুঁজিবাদ দ্রুত এগোচ্ছিল। কৃষিভিত্তিক আমেরিকা রূপান্তরিত হল শিল্পভিত্তিক দেশে। খুব দ্রুত তা হল পৃথিবীর প্রধানতম শিল্পভিত্তিক দেশ।

ফলে অঙ্কের নিয়মে উন্নত পুঁজিবাদ পরিণত হল সাম্রাজ্যবাদে। এ সময়ে তুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ দস্যুবৃত্তি চালাচ্ছে। আমেরিকা বাইরের বাজারের দরকার ভালই বুঝল আর বিশেষ করে চীন তার নজরে পড়ল।

চীন-জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪-৯৫) কিছু আগে থেকেই আমেরিকা, রাজনীতিক ও সামরিক আগ্রাসনের উপরে চীনের অর্থনীতিতেও ঢুকে পড়ে,—প্রধানত চীনের ঘাড়ে সওদার মাল চাপিয়ে দিয়ে,-যেমন সুতীবস্ত্র ও কেরোসিন। আফিম ব্যবসায়ে আমেরিকা অংশীদার তো ছিলই। চীন-জাপান যুদ্ধের পর চীনের অর্থনীতিতে মার্কিনী অনুপ্রবেশে এক নতুন অধ্যায় দেখা দিল। সিমোনস্কি চুক্তির সুযোগ নিয়ে চুক্তিতে উল্লিখিত চীনের বন্দরে বিদেশীরা শিল্পনির্মাণ করতে পারবে এই কথার ভিত্তিতে মার্কিনী পুঁজি চীনে সুতো, কাগজ ও চালকল, সিগারেট কারখানা স্থাপন করল।

এখন তারা চীনের বুকে অনেক চার্চ, স্কুল ও সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করল। উদ্দেশ্য নিজেদের চীনা অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ ও শোষণকে একই সঙ্গে জোরদার করা ও "ভালো কাজের" পর্দা ফেলে লুকিয়ে রাখা। এ সবের মধ্য দিয়ে চীনা বুদ্ধিজীবীদের মার্কিণ শিবিরে ঢোকানো এ উদ্দেশ্যের আরেক দিক। অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নগ্ন শোষণ ব্যবস্থার চেয়ে এ কৌশল অনেক কার্যকরী হল। শতাব্দীর শেষে দেখা গেল, চীনে মার্কিনী সাংস্কৃতিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারে।

মাঞ্চু সরকারের তুর্নীতি ও তুর্বলতাকে স্পষ্ট করে দেখল চীনের জনগণ চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে। চীনের সকল প্রগতিশীল মানুষই তখন ভাবছেন যে মাঞ্চু সরকারের শাসন দেশের আরো তুরবস্থা ঘটাবে। ঠিক এই সময়ে রাজনীতিতে এলেন মহান গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ক্যান্টন থেকে তিয়েন্‌ৎসিন গিয়েছিলেন আর লি হুয়াং-চিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে

চেয়েছিলেন। লি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। ডাঃ সান ভেবেছিলেন লি-কে বুঝিয়ে বলতে পারলে দেশে রাজনৈতিক সংস্কার ঘটানো যাবে।

কিন্তু লি-র সঙ্গে দেখা হল না। তারপর ক্রমশ ডাঃ সান বুঝলেন যে চীনকে বাঁচাতে হলে মাঞ্চু সরকারকে উৎখাত করতে হবে, অন্য পথ নেই। এ বছরই তিনি চলে গেলেন হনোলুলু; সেখানে প্রবাসী কুড়ি জন ছোট দোকানী ও ছোট জোতদারকে নিয়ে গড়লেন বুর্জোয়া বিপ্লবী সংগঠন শিং চুং হুই বা "চীন পুনর্জাগরণ সমিতি।"

১৮৯৫ সালে ডাঃ সান দেশের গোপন সংগঠন কে লাও হুই-র (বয়স্কদের সমিতি) সমর্থন পান ও ক্যান্টনে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটান। অবশ্য এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। এর গোপন খবর আগেভাগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

চীন-জাপান যুদ্ধের আগের কয়েক বছরেই, চীনে যে পুঁজিবাদের সূচনা ইতিমধ্যে ঘটেছিল, তা বাড়তে থাকে। চীনের নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিমূলক সংস্কারবাদী চিন্তাও দেখা দেয়। যুদ্ধের ফলে চীনের জাতীয় সমস্যা স্বাভাবিক ভাবেই হতে থাকে তীব্রতর। নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থবাহী বুদ্ধিজীবী সমাজ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে এখন জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় শিল্পোদ্যোগের বিকাশের দাবী জানাতে থাকে। ফলে সংস্কার আন্দোলন শাসক-শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে বেশ ছড়িয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন কাং উ-ওয়েই। কাং ছিলেন পশ্চিমী বুর্জোয়া ভাবধারায় লালিত। জাতীয় পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশ ও শিল্পোদ্যোগে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, এ দুয়ের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন কাং। একই সঙ্গে তিনি দাবী জানালেন জাতীয় স্বাধীনতা চাই। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চাই, রাজ্যের কাজকর্মে বুর্জোয়ারা অংশগ্রহণ করা চাই। কাং-এর অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন লিয়াং চি-চাও এবং তান ৎজে-তুং।

লিয়াং জাতিকে বাঁচাবার দাবী করেন। স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারকে আক্রমণ করেন। ইম্পিরিয়াল সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা, আধুনিক স্কুল স্থাপন, সরকারকে ঢেলে সাজা, অঞ্চলভিত্তিতে স্বয়ং-শাসন প্রবর্তন, সবই ছিল তাঁর দাবী।

বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তান জাতির উপর অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কঠোর বিরোধিতা করেন। সামন্ততন্ত্রী চিন্তাধারা নির্মূল করতে তিনি প্রচার চালান এবং সম্রাটের সর্বময়তাকে ধিক্কার দেন। তান এক অসামান্য চিন্তাবিদ সে সময়কার।

এ ভাবে দেশে নতুন চেতনার বিস্তার ঘটে আর সংস্কার আন্দোলন ঘটাবার জন্য মানুষের মন তৈরি হয়।

এই সময় তখনকার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও অনুবাদক ইয়েন ফু বের করেন শও ওয়েন পাও বা জাতীয় সংবাদ দৈনিক। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি জগতে যে চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছিল, সে বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ বের করতে থাকেন। সামন্ততন্ত্রী সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত বলে সংস্কারপন্থীরা যে দাবী করছিলেন, ইয়েন তা সমর্থন করেন এবং বলেন যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে চীনের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা শেখা উচিত। ইয়েন-এর এই প্রচার সমকালীন চীনে সংস্কারবাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটায়।

১৮৯৫ সালে সিমোনস্কি চুক্তির সময়ে কাং উ-ওয়েই রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা দেবার জন্য পিকিংয়ে ছিলেন। যে এক হাজার শিক্ষিত চীনা তখন প্রদেশের পরীক্ষায় পাশ করে রাজধানী পিকিংয়ে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা দেবেন বলে এসেছিলেন, তাদের দিয়ে এক আর্জি করালেন সম্রাটের কাছে কাং। আর্জিতে চুক্তিপত্রে সই করতে অসম্মত হতে বলা হয় ও আশু সাংবিধানিক সংস্কার দাবী করা হয়। কট্টর সামন্ততান্ত্রিক আমলা অবশ্য আর্জিটি সম্রাটের কাছে পৌছতে দেয় নি।

কাং প্রকাশ করলেন চুং ওয়েই চি ওয়েন পাও বা বিশ্ব বুলেটিন।

উদ্দেশ্য, সংস্কারের দাবীকে আরো জোরদার করা, ধনতন্ত্রবাদী নীতি প্রচার, আন্তর্জাতিক খবরাখবর প্রকাশ। এ প্রচার এমন গুরুত্ব পেল যে মাঞ্চু দরবারের বেশ কিছু সদস্য মিলে পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য চিয়াং শুয়ে হুই বা "শক্ত সমাজ কি ভাবে গড়তে হবে" নামীয় সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠনে কাং নিয়মিত রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। এ সময়ে রাজনৈতিক সংস্কারের আরেক প্রবক্তা হুয়াং ৎসুন-শিয়েনও প্রকাশ করেন শিহ্ উ পাও বা "সমকালীন ঘটনাবলী" নামে একটি কাগজ।

১৮৯৭ সালে জার্মানী কিয়াওচৌ উপসাগর দখল করে। চীনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে। কাং উ-ওয়েই আবার সম্রাট কুয়াং স্যু-র কাছে আবেদন পাঠান। এবার তা পৌঁছল সম্রাটের হাতে। সম্রাট কাং-কে আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠালেন। এর মধ্যে কাং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাও কুয়ো হুই বা "দেশের মুক্তির জন্যে সংগঠন" প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সংগঠন সমাজের উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবীদের দেশাত্মবোধক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

১৮৯৮ সালের জুন মাসে সম্রাট কুয়াংস্যু রাজনৈতিক সংস্কার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। কি ভাবে তা কার্যকর করা যাবে তা ঠিক করার জন্য কাং-এর সঙ্গে আলোচনাও করেন। কাং হলেন এখন সম্রাটের পরামর্শদাতা। সংস্কারবাদের প্রবক্তারা অনেকেই সম্রাটের গ্র্যাণ্ড কাউনসিলে কাজ করতে থাকলেন বিভিন্ন বিষয়ে।

সম্রাট কুয়াং স্যু রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে যে সব নির্দেশ জারি করলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) পুরণো কেতায় ধ্রুপদী-প্রবন্ধ লিখে পরীক্ষা-প্রথার নিষিদ্ধকরণ।

(২) ধর্ম মন্দির ও অকেজো অচল বিদ্যায়তনগুলিকে নতুন ধরণের কলেজ ও হাইস্কুলে পরিণত করা।

(৩) সবুজ পতাকা সৈন্যবাহিনী সংকোচন।

(৪) সরকারী কর্মচারী ও পরিষদ সংকোচন।

(৫) একটি জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।

(৬) খনি ও রেলওয়ে প্রশাসন প্রতিষ্ঠা।

(৭) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য দপ্তর প্রতিষ্ঠা।

(৮) শিল্প উন্নয়নে উৎসাহ দান।

(৯) ব্যক্তিগত মালিকানায় গোলাবারুদ তৈরি অনুমোদন।

(১০) রাজ্য বাজেট বিষয়ে তদন্ত ও তথ্যসঞ্চয়।

(১১) পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

(১২) নতুন বই ছাপা ও নতুন আবিষ্কারের উন্নয়ন।

(১৩) বই-অনুবাদ দপ্তর স্থাপনা।

(১৪) আধুনিক নিয়ম মতে সামরিক বাহিনীর জোর প্রশিক্ষণ।

আরো কিছু কিছুও ছিল।

কাং উ-ওয়েই, লিয়াং চি-চাও, মোহবশে ভেবেছিলেন, সংস্কার খুবই সহজ কাজ। সম্রাট ঘোষণা করলেই সংস্কারের কাজটা হয়ে যাবে। আসলে মাঞ্চু প্রশাসনে ক্ষমতার রাশটা ছিল রাজপরিষদের কিছু সামন্ততন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীলের হাতে। এঁদের নেত্রী ছিলেন সম্রাটের অভিভাবিকা সম্রাজ্ঞী ৎজু-শি। সম্রাটের এই খুড়িমাটির সংস্কারে বেজায় আপত্তি এবং সম্রাটের ঘোষণা নাকচ করার জন্যে ইনি আদা নুন খেয়ে লেগে গেলেন।

ইনি প্রথমেই এঁর পরম বিশ্বস্ত জুং লু-কে চিহ্‌লি-র শাসন কর্তা করে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার আধুনিক কেতায় সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীকে হাত করাই বিশেষ উদ্দেশ্য। তারপর তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য হল সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য সম্রাট কুয়াংসুকে নিয়ে তিয়েনৎসিনে যাওয়া ও সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করা।

এ খবর জানতে পেরে সম্রাট কাং-এর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন পদমর্যাদায় যে সেনানায়ক জুংলু-র ঠিক নিচে, সেই ইউয়ান শি-কাইকে হাত করে বিপদ ঠেকাতে হবে। সেই মত

কথাবার্তাও হল। কিন্তু ইউয়ান বেইমানি করে বসল। পরিণাম দাঁড়াল এই, সাম্রাজ্ঞী ৎজু-শি গৃহবন্দী করলেন সম্রাট কুয়াং স্যুকে। আর সংস্কারবাদীদের জেলে পোরার হুকুম দিলেন। কাং ও লিয়াং বিদেশে পালালেন। বহুজন কারাগারে গেলেন। তান, লিউ, লিন্ প্রমুখ অনেকের প্রাণদণ্ড হল।

আন্দোলনটি ব্যর্থ হল এখনকার মত। এ সংস্কার মাত্র শ'খানেক দিনের জন্য কার্যকর হয়েছিল, সেহেতু এ ঘটনা ইতিহাসে একশো দিনের সংস্কার নামে খ্যাত হয়ে আছে। চীনের সামাজিক-আর্থনীতিক রাজনীতিক কেমন পরিস্থিতিতে সংস্কার আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল, তা আমরা দেখলাম। যে ভাবে এই একশো দিনের সংস্কার গড়ে ওঠে, তা সফল হতে পারত না কিছুতে। তবে ওটুকু ঝড়ও গুরুত্বপূর্ণ। সেটা যেন ছিল ঝড়ের প্রথম অবস্থা। পরে তাই ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত ও বিশাল হয়। এ সব যখন চলছে, তখনই মায়ের শেষ সঞ্চয় আট ডলার সম্বল করে লু্ শুন এলেন নানকিংয়ে নেভাল অ্যাকাডেমিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ১৮৯৮ সালে। চীনের এবং আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে লু শুনের বড় হবার সময়টিতে এবং তারপরে চীনের ইতিহাস এমন রক্তাক্ত বন্ধুর পথের যাত্রী হয়েছিল। মানুষ সময়কে তৈরি করে ও সময়ও মানুষকে তৈরী করে, তাই নয় কি?

লু শুন নেভাল অ্যাকাডেমির পরীক্ষায় পাশ করলেন ১৯০০ সালে। কিন্তু এ অ্যাকাডেমিতে তাঁর মন লাগল না। ১৯০০ সালে তিনি কিয়াংনান সেনা অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত রেলওয়ে এবং খনি বিদ্যালয়ে গেলেন।

না, এখানেও তাঁর মন ভরেনি। জ্ঞান হবার পর থেকে যে ছেলে একদিকে পুড়েছে দুঃখের আগুনে, দারিদ্র্যে, প্রাচীন বিশ্বাসের বদ্ধ আবহাওয়ায়,—যার মুক্তি ছিল গ্রামীন কৃষক পরিবারের ছেলেদের সান্নিধ্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে—যাঁর অন্তরতম অন্তরে চলিষ্ণুতার মন্ত্র

বাজে,—সে কেমন করে এমন সহজে সামরিক রীতি-নীতি প্রভাবিত বিদ্যালয়ে স্বচ্ছন্দ হবে?

তবু মফঃস্বল থেকে শহর। শাও-শিং থেকে নানকিং। ধীরে বহে চলা শান্ত নদী থেকে খরস্রোতের তরঙ্গ। সতৃষ্ণ, পিপাসু, সদাজাগ্রত মন নিয়ে লু শুন সবই গ্রহণ করতে জানেন। এখানে তাঁর পরিচয় হল বুর্জোয়া সংস্কার, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে। দেশের সমকালীন আসল চেহারাটা শাও-শিংয়ে বসে জানতে হত হাতফেরতা, প্রত্যক্ষ জানতে পেতেন না। এখন প্রত্যহই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে থাকলেন সব। নিজেকে গড়ে তোলার কোন সুযোগ আগে ছিল না। এখন তিনি পড়তে থাকলেন বিদেশের আধুনিক সাহিত্য আর বিজ্ঞান।

লু শুন যখন নানকিংয়ে, তখনই ঘটল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ই হো তুয়ান বা বক্সার অভ্যুত্থান। শাও শিং-এ থাকার সময়ে কৃষক পরিবারগুলিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন লু শুন। আর তখনি সামন্ত শোষণের বাস্তব ও ভয়ানক চেহারাটা তিনি ভাল ভাবে দেখে নেন। নানকিংয়ে আসার আগে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়ংকরতা তিনি দেখেন নি। এখন তাঁর চোখে স্পষ্ট হল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নগ্ন রূপ। মাঞ্চু শাসকরা যে কতখানি দেউলিয়া, তাও তিনি দেখলেন।

চীন-জাপান যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আরো দাপটে, অনেক বেশি করে চীনের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতা দখলে আনতে থাকে। আগের চেয়ে অনেক বেশি পণ্যদ্রব্যে তারা বাজার ভরে দিল। ১৮৬৪-৯৯, এই পঁয়ত্রিশ বছরে চীনের আমদানি ৫১ মিলিয়ন তাল রূপা থেকে ২৬৭ মিলিয়ন তাল রূপায় পৌঁছয়। চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আগে গড়ে ২ মিলিয়ন তাল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত থাকত। এখন তা পর্যবসিত হল ৬৯ মিলিয়ন তাল আমদানি-উদ্বৃত্তে। ফলে চীনের রৌপ্য সঞ্চয় প্রায় শেষ হয়ে গেল।

কলে বোনা বিদেশী কাপড় আর সুতা আমদানির ফলে দেশের

তাঁতিরা, বিশেষ করে নগর ও গ্রামের হস্তশিল্পীরা নিঃস্ব হতে বসল। বিশেষ চোট খেল পরিবারভিত্তিক ছোট শিল্পকেন্দ্রগুলি। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মেয়েরা ও হস্তশিল্পীরা জীবিকা হারাল। রেল ব্যবস্থা ও টেলিগ্রাফ-সংবাহন ব্যবস্থা চীনের পুরনো পরিবহন ব্যবস্থাকে অচল করে দিল। ফলে হাজার হাজার মানুষ হল বেকার।

সিমোনস্কি চুক্তির কারণে বিশাল অঙ্কে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে মাঞ্চু সরকার জনগণের ওপর চারগুণ অত্যাচার ও শোষণ বাড়াল। সরকার বাজারে ছেড়েছিল একশো মিলিয়ন তালের ঋণপত্র, তা অচিরে সমস্ত রকম কর বাড়িয়ে দিল।

এ সময়ে

জমি ও ভোট-কর বাড়ে সাত গুণ;

লবণ-কর বাড়ে "ক্যাটি" (ওজন) প্রতি চার তাম্র মুদ্রা।

পিকিং, শাংহাই হ্যাংকাও ও অন্য নগরে বসে গৃহ-কর।

বহু শহরে বসে দোকান-কর।

মাঞ্চু সরকারের কর-সংগ্রাহকরা নির্ধারিত করের অঙ্কটা চার গুণ বাড়ায় নিজেদের পেট মোটা করবে বলে। মানুষের অবস্থা হয় শোচনীয়।

এই অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু সরকার চূড়ান্ত শোষণে চীনের জনজীবনে নামিয়ে আনল ভয়াবহ দারিদ্র্য। আর এ সময়েই কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশকে তছনছ করে ফেলে।

১৮৯৭ সালে কিয়াংসুতে হয় প্রবল বন্যা। বন্যাপীড়িত মানুষ গাছের ছাল, ঘাস খেয়ে থাকে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু শিশুদের বেচে দেয়। খামার-গোলাবাড়ি ছেড়ে পথে বেরোয় ভিখিরি হয়ে।

পরের বছর দক্ষিণ-পূর্ব হোপেই ও পশ্চিম শানটুং ভেসে যায় আরো প্রলয়ংকরী এক বন্যায়। চাষীর ঘর ও খামার ভেসে যায়। অপার শস্যক্ষেত্র জলে ডুবে যায়। ১৭০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দেশীয় সামন্তবাদী শাসকদের নির্মম শোষণ, এ সব জনগণকে বিপ্লবের পথে পা বাড়াতে বাধ্য করে।

১৮৯৫ সাল থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছে।

কিয়াংসি আর আনওয়েই প্রদেশে বিদ্রোহ হয় তা তাও হুই বা বড়ো তরোয়াল সমিতির নেতৃত্বে।

চেকিয়াং-তে একের পর এক চালের দোকান লুঠ হয়।

বৈদেশিক শক্তিকে আরো মদত দেবার বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়ায় সাংহাই ও আময়ে।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে য়ুনানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ফরাসী মিশনারীদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে জেচুয়ানে জনগণ লড়াই শুরু করেন। আফিম যুদ্ধের পর থেকে জেচুয়ানের জনগণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই করে এসেছেন। কিন্তু ১৮৯৮ সালে ইউ তুং-চেনের নেতৃত্বে এ আন্দোলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ আন্দোলনে জেচুয়ানের জনগণ শ্লোগান তোলেন, "বিদেশী আগ্রাসনকারীদের হটাও" এবং সরাসরি ফরাসী মিশনারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন।

ফরাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন? বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন? মাঞ্চু সরকার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করতে, চীনা মানুষকে মারতে, তড়িঘড়ি সৈন্যদল পাঠাল। কিন্তু সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে এল। সেনাবাহিনীর জয়ী হবার কথাও নয়। কেননা এই দেশাত্মবাদী বিদ্রোহ তখন জনগণের সমর্থন পেয়েছে, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সারা প্রদেশ জুড়ে উড়ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পতাকা। ইউ তুং-চেনের ছবি টাঙানো হচ্ছে ঘরে-ঘরে, দোকানে-বাজারে।

আফিম যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদীরা অসম চুক্তির ফলে চীনে তাদের ধর্ম প্রচারের অধিকার পায়। বিদেশী মিশনারীরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হয়ে চীনে কাজ করছিল। মিশনারীদের ক্ষমতা ও প্রতাপ দেখে বুকে বল পেয়ে মাঞ্চু রাজকর্মচারীরা এদের মদতে চাষীর

জমি ছিনিয়ে নিতে শুরু করে। কিছু মিশনারী চার্চের মধ্যে আদালত বসিয়ে চাষীদের বিচার করতে ও শাস্তি দিতে শুরু করে। কারো কারো ঔদ্ধত্য এমন বাড়ে যে মাঞ্চু রাজকর্মচারীদের বাধ্য করে তাদের নির্দেশমত কাজ করতে।

ঔপনিবেশিক দেশে চার্চ ও মিশনারীদের তাপ-দাপ এমনই হয় বটে। আর মিশনারীদের কর্মক্ষেত্র যদি গরিব-গুরবো অঞ্চলে হয় তাহলে তো কথাই নেই।

মাঞ্চু সরকারের মদত পুষ্ট মিশনারীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে সরকারী অফিসার সাহস পেত না। আদালতের কাছে চীনের নাগরিকের কথা না শুনে আদালত মিশনারীর পক্ষ নিত।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও মিশনারীদের অত্যাচার শেষ পর্যন্ত চীনের জনগণকে সম্মিলিত, একতাবদ্ধ করে। শুরু হয় ই হো তুয়ান আন্দোলন।

এ আন্দোলনের নাম প্রথমে ছিল ই হো চুয়ান। তখন এঁরা এক গোপন মাঞ্চু-বিরোধী সংগঠন হিসেবে কাজ করছিলেন এবং আগে এঁরা শ্লোগান রেখেছিলেন, "মাঞ্চুদের বিরোধিতা, মিং-দের ফিরিয়ে আনা।"

এই সংগঠনের নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। শানটুং-এর গভর্ণর উ-শিন, এদের সংগঠনটিকে বৈধ বলে মেনে নেন। তারপর এর নতুন নাম হল ই হো তুয়ান, বা ন্যায়পরায়ণতা ও সমন্বয় সমিতি।

জনগণ তখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকারী, যারা বিদেশী, তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উন্মুখ। ই হো তুয়ান তাই নতুন শ্লোগান বেছে নিল, "বিদেশী হটাও, রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাও।" এরা এখন অচিরে স্থানীয় বৃহৎ জনগণের সম্পূর্ণ সমর্থন পেল এবং হয়ে উঠল বলীয়ান।

১৯০০ সালের মধ্যেই ই হো তুয়ান এক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঘাবড়ে যায়। মাঞ্চু সরকার তাদের তাঁবেদার, আর জনগণ তাদের বিরোধী. এ কেমন হল? তারা মাঞ্চু সরকারকে এ বিদ্রোহ দমন করতে বলে এবং এ কথাও বলে, যে নচেৎ তারা নিজেরা নামবে বিদ্রোহ দমনে।

১৯০০ সালের এপ্রিলে ই হো তুয়ান, মাঞ্চু সরকারের সকল সামরিক বাধা দান তুচ্ছ করে, বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, পিকিং ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে এরা হো পেই, তিয়েনৎসিন, পাওতিং, শানসি অধিকার করেছে। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম চীনে ই হো তুয়ান আন্দোলন উত্তাল হয়েছে। এ এক বিরাট বিপ্লব এখন।

এখন বৃটেন, আমেরিকা, জাপান, ইটালি, রাশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্স নামে আসরে। তারা তাকু বন্দর থেকে যুদ্ধ জাহাজ ছাড়ে, তিয়েনৎসিন ও পিকিংয়ে পাঠায় সেনাবাহিনী। এখন বিদেশী সেনাদলকে একই সঙ্গে ই হো তুয়ান ও মাঞ্চু সামরিক বাহিনীর সাধারণ সেনাদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়।

১৮৯৮ সালেই সাম্রাজ্ঞী ৎজু-শি সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন, ১৯০০ অবধি তা পারেন নি সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত চীনা সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য। পিকিংয়েই হো তুয়ান যখন ঢুকল, বহু নাগরিক ও বহু মাঞ্চু রাজকর্মচারী তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

ৎজু-শি এখন সম্রাট অনুগামীদের ও ই হো তুয়ান দলকে এক সঙ্গে ধ্বংস করার জন্যে দুমুখো নীতি চালালেন। ই হো তুয়ান নেতাদের ডেকে, তাদের "ন্যায়পরায়ণ মানুষ" খেতাব দিলেন ও তাদের সমর্থন জানালেন।

১৯০০ সালের জুন মাসে ৎজু-শির মাঞ্চু সরকার সম্রাট অনুগামীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মাঞ্চু সরকারের সেনাদল ও ই হো তুয়ান যুদ্ধে নামে হাত মিলিয়ে।

আর ক্ষমতাশীল মাঞ্চু সরকার ভিতরে ভিতরে সম্রাট বাহিনীকেও সমর্থন জানায় ও বিদেশী শক্তিদের বলে, মাঞ্চু সরকার আসলে ই হো তুয়ান বিরোধী, এবং ই হো তুয়ানদের ধ্বংস করার জন্য চাই সেনাদল। এবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সেনাবাহিনী, সম্রাটপন্থী সেনারা ভীষণ ভাবে তৈরি হয়ে বিপ্লব দমনে নামে। ই হো তুয়ান আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

দেশাত্মবোধক ই হো তুয়ান অন্দোলন মূলে ছিল কৃষক

আন্দোলন। এর ব্যর্থতার কারণ মাঞ্চু সরকারের বেইমানি এবং অন্যদিকে সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ।

১৯০১ সালে মাঞ্চু সরকার লি হুং-চুং-কে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে এক অপমানজনক শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তি "প্রোটোকল অফ ১৯০১" নামে খ্যাত।

এর ফলে চীনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ৪৫০ মিলিয়ন তাল রূপা। অন্যদিকে তাকে কথা দিতে হয় যে দেশে কোন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ঘটলে অবিলম্বে তা দমন করতে হবে। এ ভাবে প্রকারান্তরে মাঞ্চু সরকারই চীনের মাটিতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে ওঠে। আর চীন দেশ হয়ে দাঁড়ায় অনেক উপনিবেশবাদীদের এক আধা-উপনিবেশ।

লু শুন সবই দেখলেন ও জানলেন। এই দেখার অভিজ্ঞতা ও জানার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী হয়ে উঠলেন। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে এক সচেতন মানুষ হয় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী হতে পারেন, নয়তো সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের সমর্থক হতে পারেন। দ্বিতীয় পথে অনেক পুরস্কার। প্রথম পথে শুধুই সংগ্রাম। প্রথম পথটিই তিনি বেছে নেন। সমগ্র দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে একতাবদ্ধ না হলে চীনের মুক্তি নেই, এ তিনি বুঝলেন।

এই সময়ে চীনা অনুবাদে তিনি পড়লেন হাকসলির "এভল্যুশন অ্যান্ড এথিক্স।" বইটি তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এ বই কেবল যে তাঁকে ডারুইনের তত্ত্ব পড়তে উৎসাহ জোগাল তাই নয়, তাঁকে বিজ্ঞান পড়তেও আগ্রহী করল। আসলে তিনি খুঁজতে শুরু করেছিলেন সেই পথ, যে পথে নতুন চীনের জন্ম সম্ভব।

বক্সার প্রোটোকল স্বাক্ষরের বছরে, ১৯০১ সালে, লুশুন রেলওয়ে ও খনি বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরোলেন। পরের বছর জাপানে পড়তে যাবার জন্য পেলেন সরকারী বৃত্তি।

॥ দুই

১৯০২ সাল। জাপানে তখন চীনা ছাত্ররা মিং রাজবংশ পতনের ২৪২ তম বার্ষিকী পালন করছে। চীনা ছাত্রদের এক ঘোষণাপত্রে মাঞ্চু শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

এ বছরেই এপ্রিল মাসে লু শুন এলেন জাপানে। কোবুন কলেজে ঢুকলেন তিনি। এই সময়ে লু শুন মনে প্রাণে দেশপ্রেমিক এক যুবক। চীনের দুর্দশা দেখে তিনি আজ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী। বাকি জীবনটা দেশের কাজে উৎসর্গ করবেন, এ তিনি ঠিক করে ফেলেছেন।

অবসর সময়ে তিনি পড়েন ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন। জাপানে এসেই তিনি আবিষ্কার করেছেন বায়রণ, শেলী, হাইনে, পুশকিন, লারমনতফ, পেতোফির মত দরদী কবিদের। কখনো জাপানী অনুবাদে, কখনো অনেক পরিশ্রম করে জার্মান ভাষায়।

লু শুন যখন জাপানে এলেন, তখন জাপানপ্রবাসী চীনা ছাত্রেরা দুই শিবিরে বিভক্ত। একদল চীনে মাঞ্চু শাসনের সমর্থক। অন্য দল তার বিরোধী। লু শুন স্বাভাবিক ভাবেই দ্বিতীয় দলের পক্ষে গেলেন। নানকিংয়ে থাকার সময়ে তিনি তো জেনেছেন যে অপদার্থ মাঞ্চু সরকার চীন দেশের মাটিকে কি ভাবে বিকিয়ে দিচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজ এ সময়েই শুরু করলেন লু শুন। ঐতিহাসিক উপন্যাস "স্পার্টার আত্মা"র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করলেন। "চীনা ভূতত্ত্বের রূপরেখা" ও "রেডিয়াম প্রসঙ্গে" নামে দুটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখলেন। এই সঙ্গে আরো অনুবাদ করলেন জুলে ভার্নের বিজ্ঞানধর্মী উপন্যাস "পৃথিবী থেকে চাঁদে" এবং "পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা"।

১৯০৪ সালের এপ্রিলে তিনি কোবুন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরোলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ঢুকলেন সেনদাই মেডিক্যাল কলেজে।

১৯০৪ সালেই হুনানে হুয়াং শিং আর তাঁর সহযোগীরা প্রতিষ্ঠা করেন হুয়া শিং হুয়ে বা "চীনা পুনরুজ্জীবন লীগ" এবং শ্লোগান তোলেন, "মাঞ্চুদের হটাও এবং চীনকে বাঁচাও"। এই লীগই পরের বছর হুনানের চাংসাতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি ঘটালেন। কে লাও হুই বা "বয়স্ক সমিতি"র হাজার হাজার সদস্য হুয়া শিং হুয়েকে সমর্থন জানান। কিন্তু খবরাখবর ফাঁস হয়ে গেল বলে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

এরই মধ্যে হুপেইতে জীহ্ চিহ্ হুই বা "প্রাত্যহিক সমীক্ষণ লীগ" নামে আরেকটি বিপ্লবী সংস্থা গঠিত হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল চীনের জনগণকে দুনিয়ার সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা আর সেই সঙ্গেই জাতীয় সংকটের মোকাবিলা করার জন্য গণসংগঠন গড়ে তোলা। খুব তাড়াতাড়ি বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল এই সংগঠনটি।

এই সকল সংগঠনই বুর্জোয়াদের গড়া। বুর্জোয়া-বিপ্লবী সংগঠন যেমন গড়ে উঠছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণারও প্রসার হচ্ছিল।

১৯০৩ সালে ৎসেউ ফুং নামে এক বুদ্ধিজীবী মাঞ্চু সরকারের শাসনব্যবস্থা যে কত দুর্নীতিতে বোঝাই, তা জানাবার জন্যে "বিপ্লবী সেনাদল" নামে এক বই লিখলেন। এই বইয়ে তিনি স্পষ্টই বললেন যে চীনের জনগণ যদি সুখী জীবন, স্বাধীনতা আর সাম্য চায়, তাহলে তাদের উচিত হবে প্রথমে মাঞ্চু সরকারের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা; তারপর বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

আরেক তরুণ বুদ্ধিজীবী চেন তিয়েন-হুয়া সরল ও জোরাল ভাষায়

প্রচার করতে থাকলেন বিপ্লবী চিন্তাভাবনা। তাঁর "চীনা জনগণের প্রতি সতর্কবাণী" এবং "জেগে ওঠো" বই দুটিতে তিনি জোর দিয়ে বললেন যে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন আজকের পৃথিবী ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে, তখন চীনা জাতি হয় জীবন, নয় মৃত্যু, এর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। হয় চীন দেশ ও চীনা জাতি বাঁচবে, নয় মরবে।

সংস্কারবাদী চিন্তা-ধারণাকে সরাসরি বাতিল করে দিলেন চেন। বললেন, দুর্নীতিপরায়ণ মাঞ্চু সরকারকে যতদিন না উচ্ছেদ করা হচ্ছে, ততদিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হাত থেকে মুক্তি নেই। চীনের সত্যিকারের মুক্তির জন্যে সকলকে ডেকে চেন বললেন, জেগে ওঠ। বিপ্লবের কাজে লেগে যাও।

১৯০১ সালের প্রোটোকল কিন্তু চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্বের কোনো অবসান আনে নি। চীনের মাটি নিয়ে তারা একই ভাবে কামড়াকামড়ি করছিল। সেটা কি ভাবে হচ্ছিল তা দেখা যাক।

(১) রাশিয়া, চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে সৈন্য সরাতে রাজী হয়নি।

(২) জাপানের অনেকদিনের ইচ্ছা যে সে উত্তর-পূর্ব চীনে প্রভুত্ব করে।

(৩) আমেরিকার নজরও ওই উত্তর-পূর্ব চীনের উপর।

(৪) ফলে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে মদত দিল।

(৫) রাশিয়ার দূর প্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটি বৃটেনও ভাল চোখে দেখছিল না। এ কারণে সেও জাপানকে সমর্থন জানাল। ১৯০২ সালের জানুয়ারিতে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি হল।

অর্থাৎ, উত্তর-পূর্ব চীনের দখল নিয়ে জাপান, আমেরিকা ও বৃটেন গেল একদিকে, রাশিয়া রইল তাদের বিরোধী হয়ে।

১৯০২ সালের এপ্রিলে রাশিয়া ও মাঞ্চু সরকার, রুশ-চীন কনভেনশনে সই করল। এই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হল যে রাশিয়া, আগামী আঠারো মাসের মধ্যে, তিন দফায় তার সকল সৈন্য উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে হটিয়ে নিয়ে যাবে।

১৯০৩ সালে, যখন রাশিয়া দ্বিতীয় দফার সৈন্য হটাচ্ছে, তখন সে মাঞ্চু সরকারের কাছে এক নতুন দাবী তুলল। এ দাবীতে বলা হল,—
(১) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশকে তৃতীয় কোনো শক্তির কাছে চীন লীজ দিতে বা সমর্পণ করতে পারবে না।
(২) যেখানে রাশিয়ার সৈন্য মোতায়েন ছিল, সে সব জায়গাকে মুক্ত বাণিজ্য বন্দর হিসেবে রাখা চলবে না।

জাপানের আগ্রাসনী উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে রাশিয়ার এ দাবীগুলি বাধা সৃষ্টি করল। জাপান তখন রাশিয়াকে জানাল যে, কোরিয়া ও উত্তর-পূর্ব চীনে জাপানের স্বার্থকে রাশিয়া যেন স্বীকৃতি দেয়। রাশিয়া এর জবাবে রইল নিরুত্তর। আর ১৯০৪ সালে জাপান, কোন যুদ্ধ ঘোষণা না জানিয়ে লুসানে রুশ নৌবহরকে আক্রমণ করল। শুরু হল রুশ-জাপান যুদ্ধ।

যুদ্ধ হল রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে। কিন্তু তার রণাঙ্গন রইল চীনের মাটি। দুই যুধ্যমান দেশের আসল উদ্দেশ্য এক। চীনের এলাকায় অবাধ লুণ্ঠন চালানো। মাঞ্চু সরকার যে কি চরিত্রের তা এ থেকে বোঝা যাবে,—

(১) নির্লজ্জের মত মাঞ্চু সরকার নিরপেক্ষ থাকার নীতি ঘোষণা করল।

(২) নিজের সার্বভৌম অধিকার আর চীনের সীমানার অধিকার রক্ষা করার সকল চেষ্টা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকল।

১৯০৫ সালে জাপান ও রাশিয়া এক শান্তি চুক্তিতে সই করে। উত্তর-পূর্ব চীনে রাশিয়া দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলের এক অংশ, এই চুক্তি মতে রাশিয়া জাপানকে ছেড়ে দিল। এমনি করেই জাপান চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ঢুকল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান, চীনের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন বাড়িয়ে চলল। প্রধানত নিজের স্বার্থ বাড়াবার উদ্দেশ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধকালে আমেরিকা জাপানকে সমর্থন করে। জাপানের তো উদ্দেশ্য

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একচেটিয়া দখল রাখা। আমেরিকাকে উত্তর-পূর্ব চীনে সূচ্যগ্র মাটি ছেড়ে দেবার কোনো আগ্রহই জাপান দেখাল না। এ সময় থেকেই জাপান ও আমেরিকার সম্পর্কে অবনতি ঘটতে থাকে।

জাপান এ সময় থেকে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে চেষ্টা করে। ফলে ১৯০৭ সালে রুশ-জাপান ও ফ্রান্স-জাপান চুক্তি হয়। ইঙ্গ-জাপান চুক্তিতো ছিলই। এ সবের ফলে জাপান ও আমেরিকার সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়।

এখন আমেরিকা দেখল যে কূটনীতিমঞ্চে সে বড়ই একলা হয়ে পড়ছে। তাই সে জাপানের সঙ্গে কিছু সমঝোতা করল। উত্তর-পূর্ব চীনে নাক গলাবার চেষ্টায় হাল ছাড়তে সে রাজী নয়। ১৯০৯ সালে আমেরিকা এক কাজ করল। সে চীন, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া জার্মানীকে এক প্রস্তাবে একটি পরিকল্পনার কথা জানাল। প্রস্তাবটি হল,

(১) "মাঞ্চুরীয় রেলপথ ব্যবস্থা নাকচ" হোক।

(২) আর উত্তর-পূর্ব চীনের সকল রেলপথ, রেলওয়েতে সকল বিনিয়োগ, আমেরিকা সহ সাতটি দেশের যুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে আসুক।

জাপান ও রাশিয়া এ প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। ফলে প্রস্তাবটি জলাঞ্জলিতে গেল।

তাতেও দমল না আমেরিকা। এর আগে সে শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ঢুকেছে, সেবাধর্মী ও সমাজসেবা মূলক কাজের আড়ালে চীনে ভালই ক্ষেত্র তৈরি করেছে। আমেরিকার দু রকম আক্রমণ অনুন্নত দেশে। একটির কথা আমরা বলেছি। আরেকটি হল ঋণ দান।

এখন আমেরিকা, ১৯১০ সালে, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীজোট বাঁধল। উদ্দেশ্য, ঋণদানের মধ্য দিয়ে চীনে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম রাখা।

সব হিসাব জুড়লে পরে দেখা যাচ্ছে যে ১৯০০ সালের পর থেকে, চীনে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দ্বিগুণ

চেষ্টা করতে থাকে। ফলে চীন ভাগ হয়ে যাবার অশুভ সম্ভাবনা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। চীনের বিপ্লবের প্রারম্ভকালও এই সময়টি।

১৯০৪ সালে লু শুন জাপানের সেনদাই মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিলেন। তখন তিনি ভেবেছিলেন যে চীনের অবস্থা বড় শোচনীয়। দেশকে তিনি সেবা করবেন রোগার্তকে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে। কোবুন কলেজে শারীরতত্ত্ব বিষয়ে কিছুই পাঠ্য ছিল না তাঁর। কিন্তু মনের মধ্যে দেশসেবার জন্য চিকিৎসক হবার আদর্শ ছিল বলে শারীরতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ জেগেছিল। কিছু বইও তিনি পড়েছিলেন।

লু শুন নিজেই লিখেছেন, "সেখানে শারীরতত্ত্ব পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না বটে, তবে "এ নিউ কোর্স অন দি হিউম্যান বডি", "এসেজ্ অন্ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড হাইজীন", এ সব বইয়ের কাঠ-ব্লক সংস্করণ আমরা দেখতাম। এখন আমি যা জানলাম, তার সঙ্গে আমার আগেকার জানা ডাক্তারদের কথাবার্তা ও ওষুধের বিধানপত্র, দুয়ের তুলনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে সে সব ডাক্তারেরা হয় না-জেনে, নয় জেনে-শুনে সজ্ঞানে ধাপ্পবাজ। যে সব মানুষ, যে সব পরিবার তাদের হাতে কষ্ট পায়, তাদের দুঃখে আমিও দুঃখী হলাম। অনুবাদে ইতিহাস পড়ে আমি এ কথাও জানলাম যে জাপানে সংস্কার ব্যাপারটির সূচনা হয় অনেকখানিই জাপানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রবর্তন করার পরে।

এ সব ছিটে ফোঁটা জ্ঞান আমাকে জাপানের এক প্রাদেশিক মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে হাজির করল। চমৎকার এক স্বপ্ন দেখলাম আমি। চীনে ফিরে আমি আরোগ্য করব আমার বাবার মত রোগীদের, যাঁদের ভুল চিকিৎসা হয়। আর যদি যুদ্ধ বাধে, আমি হব সামরিক ডাক্তার। সে ভাবেই সেবাকার্য করব, আর একই সঙ্গে সংস্কার বিষয়ে আমার দেশবাসীর আস্থাকে করব দৃঢ়তর।"

চীনের অসুস্থ জনগণকে সুস্থ করতে পারবেন ভেবেই তিনি যে

আগ্রহ নিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে এলেন, সে আগ্রহের বিনাশ হল অঙ্কুরেই। রুশ-জাপান যুদ্ধ যে চীনের মাটিতে চলছিল তা তো আমরা বলেছি। এই যুদ্ধ চলার কালে জাপানে অনেক হ্রস্ব সংবাদচিত্র দেখানো হত। জাপান সরকার এ নিউজরিলের মাধ্যমে নিজেদের সপক্ষে জনমত গড়ত, প্রচার চালাত।

এই সংবাদচিত্রের একটি দেখলেন লু শুন। নির্যাতিত চীনা মানুষের নিরাসক্ত ও অনাদৃত অনেক মুখের ছবি। লু শুন তখন তাঁর স্বদেশকে চেনেন। জানেন যে সামন্তবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুখে নিপীড়িত চীনা জনগণ কি অসহায়। ফলে ছবিটি তাঁকে ভীষণ ভাবে ধাক্কা দিল। তিনি বুঝলেন যে শরীরের সুস্থতা এনে দিলেও চীনের জনগণ সুস্থ হতে পারবে না। সবচেয়ে দরকারী কাজ, তার মানসিক পরিবর্তন ঘটানো।

"অস্ত্রের ডাক" গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লু শুন স্পষ্টই বলেছেন, "...একদিন একটা ফিল্মে দেখলাম কিছু চীনা মানুষ। একজনের হাত-পা বাঁধা, অনেকে তাকে ঘিরে রয়েছে। এরা সবাই দিব্য জোয়ান, কিন্তু একেবারেই উদাসীন। ধারাভাষণে জানা গেল, যার হাত বাঁধা আছে, সে এক গুপ্তচর। রুশীদের হয়ে কাজ করছে। জাপানী সামরিক সৈন্য তার মাথা কেটে ফেলে অন্যদের হুঁশিয়ার করে দেবে। আর ওই লোকটার পাশের চীনারা এসেছে তামাশা দেখতে।

আমার পাঠ্য মেয়াদ শেষ হবার আগেই আমি টোকিও চলে যাই। কেন না এই ফিল্ম দেখে আমি বুঝলাম যে চিকিৎসা বিজ্ঞান শেষাবধি তেমন জরুরি কিছু নয়। যে দেশ দুর্বল ও পশ্চাৎপদ, তার মানুষ যত সুস্থ ও বলিষ্ঠ হোক না কেন, তারা হয় ওরকম অর্থহীন নৈরাশ্য পূর্ণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখবে, নয় তাদেরকে তাতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যত জনই অসুখে মরুক না কেন, তাতে আসলে সত্যিই কিছু এসে যায় না। আসল কাজ হল ওদের মনে পরিবর্তন আনা। যেহেতু সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে সে কাজ করতে হলে সাহিত্যই

হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা, আমি ঠিক করলাম যে এক সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে তুলব।"

এই ঘটনাটুকু গভীর ভাবে চিন্তা করবার। সব ঘটনা সব সময়ে এমন হয় না, যা থেকে নানারকম সত্য উদ্‌ভাসিত হয়। এই ফিল্‌ম দেখা ও দেখানোর মধ্যে অনেক কথা জানা যাচ্ছে।

(১) জাপান চীনের মাটির দখল নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে লড়ছে চীনের মাটিতেই। সে জন্য দাম দিচ্ছে চীনেরই মানুষ, যারা দুই দেশের কারো অধীন নয়। জাপানকে এ তথ্যচিত্র করতেই হবে, কেন না সে জানে যে সে অন্যায় করছে এবং অন্যায়ের জন্য "আমি ঠিক করছি" এই প্রচার তাকে করতেই হবে। প্রচার চিত্র সে কাজে খুব ভালো মাধ্যম।

(২) নির্যাতিত, নিপীড়িত কোনো দেশে যদি সরকার হয় অপদার্থ, দেশ বিকানো থাকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে, এবং ই হো তুয়ানের মত প্রবল সশস্ত্র গণবিদ্রোহ, খণ্ড খণ্ড বিপ্লব প্রচেষ্টা, সবই হয় বিফল, তাহলে মানুষ নৈতিক বল হারায়, "যার মাথা কাটবে, সে আমারই ভাই", এ বোধ তার থাকে না। তাই চীনারা তামাশা দেখতে এসেছে।

(৩) এ তথ্যচিত্রের ক্রূর অভিসন্ধি সিদ্ধ করছে ওই দর্শকদের নির্বেদ পূর্ণ মুখ। তথ্যচিত্রটি চীনের জনগণকে বোধশক্তিহীন পশু রূপে দেখাতেও চায়।

(৪) এটি দেখার পর লু শুনের মানসিক প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে লক্ষ্য করবার। তিনি কখনো ভাবছেন না, যে মানুষরা নিজের ভাইয়ের শিরচ্ছেদ নির্বেদে দেখে, তাদের কিছুই হবে না। তিনি বুঝছেন যে শাসনে, শোষণে, অন্যায়ে, অবিচারে, বহু বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ব্যর্থতায় মানুষগুলির মনে যুগান্তের অন্ধকার। তাই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ওদের মনকে সচেতন করতে হবে।

(৫) লু শুনই ঠিক, অন্যকোন ভাবে ভাবনা করা ভুল।

(৬) এই সব কথাই ওই ঘটনাটি থেকে উদ্ভাসিত হয়। আর সমান গরিব ও শোষিতকে মরতে দেখে নির্বেদে, মারে মহোল্লাসে, তবে বুঝতে হবে যে সে দেশে সাধারণ লোক চূড়ান্ত হতাশায় নেমে গেছে নিচে। তখন সে সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার গিনিপিগ নয়, তার দরকার প্রকৃত বন্ধু ও দরদী জনের। লু শুন ঠিক কাজই করেছিলেন।

১৯০৬ সালে লু শুন সেনদাই মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে দেন। মনে মনে তখন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে লেখার দ্বারা জনচেতনাকে জাগ্রত করবেন।

১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি "নতুন জীবন" নামে একটি পত্রিকা বের করার চেষ্টা করেন। মনে ইচ্ছা, আগামী বিপ্লবী সাহিত্যজীবনের সেটি হবে প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু নানা কারণে পত্রিকাটি বের করা সম্ভব হল না।

এর কিছুদিন পরেই লিখলেন, 'বিজ্ঞানের ইতিহাস', 'সংস্কৃতির ধারা, 'দৈত্যতুল্য কবিদের প্রসঙ্গে', এ সব এবং আরো অনেক প্রবন্ধ।

এ সব প্রবন্ধে তিনি জৈবিক বিবর্তন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে পশ্চিম জগতের তত্ত্বের সঙ্গে চীনের পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। দৈত্যতুল্য কবিতা ধারায় লিখিত কবিতাকেও পরিচয় করান। উদ্দেশ্য মানুষকে অবহিত করা।

আসলে এ সব লেখায় তিনি কেবলমাত্র চীন ও বিদেশের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করলেন না, পৃথিবীর ইতিহাসের ধারার তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করে তার সহায়তায় চীনের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চাইলেন।

১৯০৮ সালে তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে মিলে অনুবাদ করলেন রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের গল্প। এর দ্বারা তিনি চীনের জনগণকে পৃথিবীর প্রগতি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাইলেন।

শিং চুং হুই (চীন পুনরুজ্জীবন সমিতি), কুয়াং ফু হুই (পুনর্গঠন লীগ) আর হুয়া শিং হুই (চীন পুনরুজ্জীবন লীগ) এ সব সংগঠন-

গুলি গড়ে ওঠার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন গতিশীল হয়। ১৯০৫ সালের রুশবিপ্লব চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভাল করেই বুঝিয়ে দেয় যে উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে বিপ্লব ছাড়া অন্য পথ নেই। চীনের বুর্জোয়ারা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁরাও সামিল হলেন মাঞ্চু বিরোধী আন্দোলনে। ফলে বিপ্লবী আন্দোলনও দ্রুত এগোতে থাকল।

সব দেশেই এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁদের লেখা পড়ে সে সময়ে দেশে কি হচ্ছিল তা বোঝা যায় না। তাঁরা দেশকে নিশ্চয় ভালবেসেছেন, কিন্তু লেখক সত্তাটির সঙ্গে দেশপ্রেমিক সত্তার কোন যোগ রাখেন নি। তাঁদের লেখার মূল প্রেরণা স্বদেশ, সমাজ ও দেশবাসীর শোচনীয় অবস্থা নয়। লু শুন অন্য জাতের লেখক। দেশপ্রেমই তাঁর সঞ্চালক শক্তি। তাই তাঁর বেলা, আরো কিছু কিছু বিশ্ব সাহিত্য পুরুষের মত, দেশের ইতিহাস জানা খুব দরকার।

এ বছরেই ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ইউরোপ থেকে জাপানে আসেন। জাপানবাসী চীনা দেশপ্রেমিকেরা তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। এতদিন বিপ্লবী সংগঠনগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছিল। ফলে কাজ আশানুরূপ এগোচ্ছিল না। তার কারণে বিপ্লবীরা প্রস্তাব করলেন, যে (১) শিং চুং হুই, (২) কুয়াং ফু হুই, এবং (৩) হুয়া শিং হুই, এই তিনটি বিপ্লবী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা হোক।

ডাঃ সান এই তিনটি সংগঠনকে একত্র করে তুং মেং হুই বা "বিপ্লবী লীগ" নামে জাপানে নতুন সংগঠন গড়লেন। এ সংগঠনের উদ্বোধনী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ সান হলেন এর সভাপতি। তুং মেং হুই-এর কার্যসূচীর নির্দেশিত পথ হল,

মাঞ্চুদের তাড়াও
চীনকে বাঁচাও
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করো
জমি মালিকানায় সমতা আনো।

এই সংগঠনের বিপ্লবী ধারণা প্রচারের জন্য মুখপত্র বের করা হল মিন্ পাও বা "জনগণের ঘোষক।"

মিন্‌পাও-এর প্রথম সংখ্যাতেই ডাঃ সান, তিন গণনীতি ঘোষণা করলেন,

জাতীয়তাবাদের নীতি
গণতন্ত্রের নীতি
জীবিকার নীতি।

এই তিন গণনীতির ভিত্তিতেই ডাঃ সান চীনের সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন।

১৯০৬ সালে হুনান ও কিয়াংসিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল লিউয়াং, লিলিং, পিংশিয়াং। সে সব জায়গার মানুষ কে লাও হুইয়ের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ করল। বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল পিংশিয়াংয়ের আনিউয়ান কয়লাখনির ছ হাজার খনিমজুর। অঞ্চলের মানুষ এ বিদ্রোহে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় ও হাজারে হাজারে যোগ দেয়। ভুং মেং হুই-য়ের বহু সদস্য এতে যোগ দিল ও স্লোগান ওঠাল।

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করো
জমিতে আনো সমান মালিকানা।

একতাবদ্ধ নেতৃত্ব ছিল না বলে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

১৯০৭-১৯০৮ সালে ডাঃ সান নিজে কুয়াংতুংয়ে ছয়টি সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। শু শি-লিন এবং শিউং চেং-চি-র নেতৃত্বে আনকিং ও আনহোয়েই-তে বিদ্রোহ ঘটে। জাপান প্রত্যাগত ছাত্র শু ছিলেন আনকিং পুলিশ অ্যাকাডেমির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ১৯০৭ সালে আনহোয়েই-এর গভর্ণর এন্ মিং যখন আনকিং পুলিশ অ্যাকাডেমির পাঠ বর্ষ শুরুর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন, তাঁকে ছোরা মারেন শু। এর পর তিনি ছাত্রদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ করেন ও ডিপো অধিকার করেন। খুবই কম সেনা ছিল তাঁর হাতে। ফলে শীঘ্রই তিনি মাঞ্চু সেনাদের হাতে পরাজিত হন।

এক বছর বাদে নয়া ফৌজের এক বিপ্লব-চেতন অফিসার শিউং চেং-চি আন্‌কিংয়ে ঘটান দ্বিতীয় বিদ্রোহ। এই নয়া ফৌজ মাঞ্চু সরকারেরই সেনাদল।

মাঞ্চু সরকার এই সৈন্যদের নিয়েছিল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে এবং এদের হাতে দিয়েছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। শিউং চেং-চি, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীকে নগরের বহিসীমান্তে সংগঠিত করেন। এ বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়।

১৯০৬ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে হুনান, কোয়াংতুং, কোয়াংসি, উনান, জেচুনে অসংখ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটে। এর অধিকাংশই তুং মেং হুই দ্বারা সংগঠিত। জনগণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সংযোগ না থাকার কারণে এ বিদ্রোহগুলি ব্যর্থ হয়। তবু এগুলি, অসংখ্য মানুষকে টেনে আনে বিপ্লবী সংগ্রামে এবং জনগণের মাঞ্চু বিরোধী মনোভাবকেও প্রচণ্ড বাড়িয়ে দেয়।

জাপান প্রবাসের আট বছর, চীনে ঘটে চলা এই সমস্ত ঘটনা, লু শুনকে গড়ে তোলে এক দৃঢ় বিশ্বাসী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক হিসেবে। এর আগে ১৯০৮ সালে তিনি সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়েছেন মাঞ্চু বিরোধী বিপ্লবীদের সঙ্গে। দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষ করে ১৯০৯ সালে লুশুন ফিরে গেলেন চীনে।

এতদিনে দেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিদ্রোহের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে মাঞ্চু সরকার কিছু 'সংস্কারের' পথ নিয়েছে। আশা, মানুষ কিছু খুশি হবে এবং তাদের মাঞ্চু বিরোধী মনোভাব কমবে। ১৯০৫ সালে ৎসাই ৎসে-র নেতৃত্বে একটি কমিশনকে বিদেশে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য, বিদেশী সাংবিধানিক নীতি বিষয়ে জেনে শুনে আসা। এক সাংবিধানিক সরকার গঠনের জন্যে তৈরি হবার কথা ১৯০৬ সালে মাঞ্চু সরকার ঘোষণা করে।

বেড়ে উঠছে বিপ্লবী আন্দোলন। তাকে থামাবার ও এড়িয়ে যাবার জন্যে হয়তো আরো কিছু করা দরকার। তা বুঝে ১৯০৮ সালে

মাঞ্চু সরকার, সাংবিধানিক সংস্কারের এক নয় সালা পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

এ বছরই মারা যায় সম্রাট কুয়াং ও তার অভিভাবিকা সাম্রাজ্ঞী। কুয়াং শু-র তিন বছরের ভাইপো পু-ই, শুয়ান তুং নাম নিয়ে রাজা হল। এই শিশু রাজার বাবা ৎসাই ফেং হল সরকারের আসল কর্তা। ৎসাই ফেং একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হল। তার দু ভাইকে যথাক্রমে নৌ বাহিনীর সেক্রেটারি এবং সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ করে দিল। এমনি করে সমস্ত সামরিক কর্তৃত্ব জমা হল প্রতিক্রিয়াশীল মাঞ্চু রাজন্যদের হাতে।

এদিকে বিপ্লবী আন্দোলন দ্রুত এগোচ্ছে ও ছড়িয়ে পড়ছে। তা দেখে মাঞ্চু সরকার তার সাংবিধানিক সরকারের প্রস্তুতির সময় কমিয়ে দিয়ে আগের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে সরকার ও পার্লামেণ্ট গড়বে বলে কথা দিল।

কিন্তু ১৯১১ সালে যখন নতুন মন্ত্রীসভা গড়া হল, তখন দেখা গেল যে এর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করে বসেছে মাঞ্চু রাজন্য ও রাজকর্মচারীর দল। তথাকথিত সাংবিধানিক সরকার গঠন বিষয়ে সরকারের এই ভাঁওতা জনগণের চোখে স্পষ্টই ধরা পড়ল। ফলে মাঞ্চু সরকার জনগণের ঘৃণা ও অসন্তোষের আগুনে আরো বেশি করে ঘি ঢালল। এটা সে সময়ের ইতিহাস বিচারে খুব স্বাভাবিক এক ঘটনা। যে সরকারের জনগণকে দেবার কিছু নেই, সে এরকমভাবে মিথ্যে আশ্বাস ও আশাই দেবে আর কাজের বেলা তাদেরই দায়িত্ব দেবে। যারা তার শোষণ ও শাসনকে কায়েম রাখবে।

লু শুন তখন প্রথমে চেকিয়াং নরমান স্কুলে এবং পরে শাওশিং মিড্‌ল স্কুলে শারীরতত্ত্ব ও রসায়নবিদ্যা পড়াচ্ছিলেন। আর অবসর সময়ে প্রাচীন দিনের কিছু ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক দলিল, যা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তা সংগ্রহ করছিলেন। সেগুলিকে "শাওশিং বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ" নামে এক সংকলনে প্রকাশ করেন।

এর পরেই এল ১৯১১ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রথম অভ্যুত্থান শুরু হল শিনচিন থেকে। আর অচিরে তা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন অঞ্চলে।

লু শুন মনে প্রাণে সমর্থন করলেন এই আন্দোলনকে। ছাত্রদের কাছে আবেদন করলেন আন্দোলনকে সহায়তা করতে। বিপ্লবী বাহিনী যখন নভেম্বরে হ্যাংচাও অধিকার করে, লু শুনের নিজের শহরে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় সকলের ইচ্ছাক্রমে তিনি হন সভাপতি।

এখানে সৈনিকদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি এক স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। এর পরেই তিনি শাওশিং মিডল্ স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গড়ে তোলেন "সশস্ত্র প্রচার বাহিনী।" এরা হাতে বেয়নেট ও রাইফেল নিয়ে শহরের পথে পথে বক্তৃতা দেবে। শাওশিং মুক্ত হবার পর স্থানীয় সামরিক সরকার লু শুনকে শাওশিং নর্মাল স্কুলের প্রেসিডেন্ট করে।

১৯১১ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে এখানে কিছু বলা দরকার।

চীনের রেলপথ নির্মাণের অধিকার পুরোপুরি নিজেদের হাতে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মাঞ্চু সরকারকে আদেশ জারি করে যে,

(১) রেলওয়েকে জাতীয়করণ করো,

(২) এ বিষয়ে (রেলপথ বসানো বিষয়ে) প্রাদেশিক কোম্পানি-গুলিকে যে অধিকার দিয়েছ, তা প্রত্যাহার করো।

এ আদেশের বিরুদ্ধে সারা চীন দেশ প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সরাসরি যাদের উপর চোট পড়বে সে সব প্রদেশ, যেমন জেচুয়ান, হুনান, হুপে এবং কোয়াংতুং হল বেশি বিক্ষুব্ধ।

জেচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেংটুতে শহরবাসীরা রেলওয়ে মালিকানায় জনগণের অধিকার রক্ষা করবার জন্য এক সমিতি গড়ে তোলেন। এঁরা স্থানীয় সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান এবং ছাত্র-শ্রমিক-ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট ডাকেন। জেচুয়ানের ভাইসরয়

অবিলম্বে রেলওয়ের অংশীদারদের প্রতিনিধিদের বন্দী করে, আবেদনকারীদের হত্যা করে নির্মম ভাবে আর সবশুদ্ধ এক ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব গড়ে তোলে।

চেংটু-র এই হত্যাকাণ্ড জেচুয়ানের জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। রেলওয়ে-অধিকার রক্ষার আন্দোলন অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্রই সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে সমিতি গড়ে ওঠে।

বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় শিনচিন-এ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জেলাগুলিতেও বিদ্রোহ শুরু হয়। শিনচিন, সুংশিয়েন, ওয়েইয়ুয়ান আর চিয়েনওয়েই-এ জেলার সদর শহরগুলি জনগণ অধিকার করে নেন। মাঞ্চু সরকার কিছুমাত্র দেরি না করে তড়িঘড়ি নয়া ফৌজ বাহিনী পাঠায়। উদ্দেশ্য হুপে থেকে জেচুয়ান পর্যন্ত আন্দোলন দমন করা। আর ঠিক এ সময়েই শুরু হল উচাং অভ্যুত্থান।

সমগ্র দেশ জুড়ে শসস্ত্র অভ্যুত্থান ও তুং মেং হুই-এর নেতৃত্বে মাঞ্চু বিরোধী লড়াই সারা দেশের মানুষের মনে আলোড়ন তুলল। সমগ্র ব্যাপারটি বিপ্লবী আন্দোলনে সুগভীর প্রেরণা জোগাল।

১৯১১ সালে যখন জেচুয়ানে রেলওয়ে-অধিকার রক্ষার লড়াই উত্তুঙ্গে, তখন ওয়েন স্যুয়ে শে, বা "সাহিত্য সমিতি", এবং কুংচিন হুই, বা "একসঙ্গে চলো লীগ" নামে দুটি বিপ্লবী সংস্থা, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মিলিত ও যুক্ত হয়। হুপে-স্থিত নয়া ফৌজের বহু লোক জেচুয়ানে প্রেরিত হবার ফলে উহানের ঘাঁটির রক্ষী বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। বিপ্লবী নেতারা অভ্যুত্থানের জন্য এর সুযোগ নিলেন।

কিন্তু নয়াফৌজের এক বিরাট অংশে বিপ্লবী সেনারাও আছে। হুপে থেকে নিয়মিত ফৌজ সরালে পরে বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে এ কথা নেতারা বুঝলেন। তাই তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি চালালেন। কিন্তু অক্টোবরের প্রথমদিকে, বিপ্লবীদের তৈরি করার সময়ে একটি বোমা হঠাৎ ফেটে যায়। ফলে তাঁদের পরিকল্পনা

জানাজানি হয়ে গেল। মাঞ্চু সরকারী কর্মচারীরা খানাতল্লাসী শুরু করল আর সক্রিয় কর্মীদের নামের তালিকা পেয়ে গেল। এর পর তারা উচাংয়ে ব্যাপক খানাতল্লাসী চালায়। ব্যাপার যথেষ্ট সঙিন হয়ে ওঠে।

বিপ্লবী নেতাদের নির্দেশে উচাং-স্থিত নয়া ফৌজ ১০ই অক্টোবর রাতে অভ্যুত্থান শুরু করে। তারা অস্ত্রাগার দখল করে ও ভাইসরয়ের প্রাসাদ আক্রমণ করে। মাঞ্চু রাজকর্মচারীরা দিশাহারা হয়ে গিয়ে পালিয়ে যায়। উচাং শহর আসে বিপ্লবীদের দখলে।

পরদিনই বিপ্লবীরা সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নতুন সেনাদলের এক ব্রিগেড কমাণ্ডার লি ইউয়ান-হাংকে ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ করেন। লি তাঁর ঘোষণাপত্রে সম্রাট শুয়ান তুং শাসনের অবসান ও চীনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। একই সঙ্গে তিনি সমগ্র দেশের জনগণকে জেগে ওঠার আহ্বানও জানালেন।

বিপ্লবীরা জোর করে ইয়াংসি নদীর পারঘাট পেরিয়ে হানইয়াং এবং হ্যাংকাও দখল করলেন।

উচাং অভ্যুত্থানের সাফল্য সমগ্র দেশের জনগণের মনে প্রেরণা এনে দিল। নয়াফৌজের ব্যাপারটির গুরুত্ব এখানে অপরিসীম। মাঞ্চু সরকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে এ ফৌজে সেনা জোগাড় করেছিল। হাতে দিয়েছিল আধুনিক কেতার সামরিক অস্ত্রশস্ত্র। সেনানীরা ছিলেন শিক্ষিত। বিপ্লবের দরকার তাঁরা ভাল করেই বুঝেছিলেন। দেশে দীর্ঘকাল অচল সামন্তবাদ, হিংস্র ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ, দুয়ের যুক্ত শোষণে যে হাহাকার জেগেছে, তার ব্যথা তাঁদের রক্তেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই তাঁরা খুব দ্রুত বিপ্লবে সামিল হতে পেরেছিলেন।

এখন শ্রমিকরা, কৃষকরা, প্রাক্তন ফৌজী সেনারা দলে দলে এগিয়ে এলেন বিপ্লবী সেনাদলে নাম লেখাবার জন্যে। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে লেগে গেলেন। স্থানীয় মাঞ্চু

বাহিনী পরাজিত হতে থাকল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সমস্ত প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

বিপ্লব আগুনের মতই দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকল। বিপ্লবের এই দ্রুত অগ্রগতিতে কিন্তু অনেক নেতাই মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। এখন তাঁদের কাজ ছিল জনগণকে সংগঠিত করা আর সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া। তার বদলে তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন কত তাড়াতাড়ি এ লড়াইয়ের অবসান ঘটবে।

এদিকে তখন সাংবিধানিক রাজতন্ত্রীরা, উচ্চপদাসীন রাজকর্মচারীরা, তাঁদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জায়গার সম্ভ্রান্ত লোকেরা বুঝে ফেলেছেন যে হাওয়া একেবারে ঘুরে গেছে। মাঞ্চু সরকারের পতন এখন ঘটবেই। তাই তাঁরা বিপ্লবীদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানাতে বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আসল উদ্দেশ্য দুটি।

চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা, শোষকরা, শোষক শ্রেণীর সমর্থক মানুষরা যখন বিপ্লবকে সহানুভূতি ও অভিনন্দন জানায়, তারা মোটামুটি তিন উদ্দেশ্যে এ কাজ করে।

(১) নিজেদেরকে আগুনের আঁচ বা জনগণের রোষানল থেকে বাঁচানো।

(২) বিপ্লব থেকে ফায়দা উঠাবার জন্য দরদী সেজে বিপ্লবী দলে ঢোকার চেষ্টা করা, এবং

(৩) বিপ্লবকে ভিতর থেকে ছুরি মারা।

ঠিক তাই ঘটতে থাকল। কিয়াংসু প্রদেশের ভাইসরয় চেং তে-চুন যখন শুনল যে একের পর এক প্রদেশ স্বাধীন হতে চলেছে, সে মাঞ্চু সরকারী আংরাখা ছুড়ে ফেলে দিল আর নিজের প্রাসাদের দরজায় "সামরিক সরকার" লেখা সাইনবোর্ড টাঙাল। অনেক প্রতিক্রিয়াশীল রাজকর্মচারী ঝটপট ভোল বদলে বিপ্লবী দলে ঢুকে পড়ল।

এটাও কোন নতুন ঘটনা নয়। এরকম হতেই পারে। বিপ্লব

যখন ঘটে তখনকার মানুষ তাকে যে চোখে দেখে, পরের সময়ের মানুষ তাকে দেখে ইতিহাস হিসেবে। বিপ্লব যখন ঘটছিল চীনে তখন তাতে প্রতিক্রিয়াশীল বহুজন ভোল বদলে ঢুকে পড়ে ১৯১১ সালের উত্তাল আন্দোলনের জোয়ারে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী লোকজন অসৎ উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল বলে মূল বিপ্লবটি অসৎ, সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায় না কখনো।

এমন এক সংকটের সময়ে দুটি বিপ্লবী ব্লক প্রতিষ্ঠিত হল। একটি উচাংয়ে ও আরেকটি সাংহাইতে। কোন ব্লকটি নেতা হবে তা নিয়ে দু দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। আলোচনার পর ঠিক হয় যে অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য উচাংয়ে এক কনভেনশান ডাকা হবে।

১৯১১ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা উচাংয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু সভার জায়গা হ্যাংকাওতে করা হবে বলে ঠিক হয়। কারণ হল, এরমধ্যে মাঞ্চু ফৌজ হানইয়াং আবার দখল করে নিয়েছে আর উচাং পড়ছে মাঞ্চু গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের সীমার মধ্যেই। এ সময়ে বিপ্লবীদের হাতে নানকিং-এর পতন সব সমস্যা মিটাল। সভাটি হল নানকিং-এ।

১৯১১ সালের ডিসেম্বরের শেষাশেষি ডাঃ সান ইউরোপ থেকে চলে এলেন সাংহাই। তাঁকে চীনা প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করা হল। এই নানকিং কনভেনশন ঠিক করল যে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম বছর গোনা হবে ১৯১২ সাল থেকে। এই কনভেনশনে প্রতিষ্ঠিত হল অস্থায়ী সরকার ও জাতীয় আসেম্ব্লি। ১৯১২ সালের পয়লা জানুয়ারি ডাঃ সান নানকিংয়ে প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করলেন। চীনা প্রজাতন্ত্রের জন্ম সূচিত হল।

অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার সময়ে সংবিধানবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি দখল করে নিল। যেমন স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, সংবাহন। সরকারের পরিচালনায় রইলেন ডাঃ সানের নেতৃত্বে বিপ্লবীরাই।

নতুন অস্থায়ী জাতীয় অ্যাসেমব্লি এক অস্থায়ী সংবিধানের খসড়া তৈরি করলেন। এতে বলা হল,

(১) চীনা প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের জাতি, শ্রেণী, ধর্ম যাই হোক না কেন, তাঁরা সবাই সমান।

(২) সকল নাগরিকের অধিকার থাকল যে কোনো জায়গায় বসবাসের বা স্থান ছেড়ে চলে যাবার। তাঁদের স্বাধীনতা থাকল বই ছাপার, বক্তৃতা দেবার, সভা করবার, সম্মিলিত হবার, স্ব-স্ব ধর্মবিশ্বাস পালনের।

(৩) তাঁদের অধিকার থাকল আবেদনের, আর্জির এবং সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবার।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধাঁচে তৈরি এই অস্থায়ী সংবিধান জনগণকে কিছু কিছু অধিকার দেয়। সে সময়ের ঐতিহাসিক পরিবেশে এ সংবিধান প্রগতিবাদী।

ডাঃ সানের নেতৃত্বে ১৯১১ সালের এ বিপ্লব হল এক বুর্জোয়া-ডেমোক্রেটিক বিপ্লব। এ বিপ্লব,

(১) চীনের শত শত বর্ষব্যাপী সামন্তবাদী রাজতন্ত্রকে অবশেষে চীনের মাটি থেকে উচ্ছেদ করে।

(২) অস্থায়ী সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে।

অর্থনীতিক্ষেত্রে এ বিপ্লব চীনে জাতীয় পুঁজিতন্ত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বিষয়ে জনমানসে প্রত্যক্ষ ধারণা সূচিত করে ১৯১১ সালের বিপ্লব।

চীনা প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বানে লু শুন গেলেন নানকিং। শিক্ষামন্ত্রকে অন্যতম সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন তিনি।

১৯১২ সালের মে মাসে অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে লু শুনও গেলেন নানকিং থেকে পিকিং। শিক্ষামন্ত্রকের সমাজশিক্ষা দপ্তরের এক

বিভাগীয় প্রধান রূপে নিযুক্ত হলেন। যখন এ দায়িত্বে ছিলেন, তখন তিনি মূল্যবান অবদান রাখলেন,

(১) নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার সপক্ষে প্রচার করে ;

(২) জাতীয় ধ্বনিমাত্রিক বর্ণমালার জন্য এক পরিকল্পনা তৈরি করে ;

(৩) জনপ্রিয় শিক্ষাক্রম নিয়ে কাজ করে ;

(৪) রাজধানীর গ্রন্থাগার ও ইতিহাস-মিউজিয়াম তৈরির প্রস্তুতি নিয়ে।

এই মন্ত্রকের কাজ করার সময়েই লু শুন চীনা সংস্কৃতি বিষয়ে মূল্যবান কাজ করেন। তিনি এ সময়ে

(১) কয়েকটি ধ্রুপদী গ্রন্থ টীকা লিখে সংকলন করেন ;

(২) প্রাচীন পাথর ও ব্রোঞ্জের লেখা নিয়ে গবেষণা করেন ;

(৩) তৃতীয় শতকের এক মহান দেশপ্রেমী কবি চি কাং-এর কবিতা সম্পাদনা করেন। চি-র কাব্যে আছে সামন্ত স্বৈরাচারী ও কট্টর কনফুশসীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার সাহস। তাতে যেন জনগণের মনের আকাংক্ষাই খানিক প্রতিফলিত হয়েছে।

(৪) তৃতীয় শতক থেকে চীনা ভাষায় অনূদিত ভারতীয় বৌদ্ধ ধ্রুপদী গ্রন্থের অনুশীলন করেন।

এদিকে ১৯১১ সালের বিপ্লব কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারল না। নামে চীন দেশ পরিবর্তিত হল প্রজাতন্ত্রে, আর রয়ে গেল আগেকার চেহারায়। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ একই ভাবে থেকে গেল আর তাদের যে ইতিহাস-নির্ধারিত ভূমিকা, তা পালন করতে থাকল।

রাজ্যের ক্ষমতা চলে যেতে থাকল জঙ্গী সেনাপতি ও বিভিন্ন চক্রের রাজনীতিবিদদের হাতে। সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে এরাই এতদিন চীনের জনগণের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে। এ পথেই জঙ্গী সেনাপতিরা জঙ্গী প্রভু সেজে বসে রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করল

স্ব-স্বাধীনতা। এখন শুরু হল এক টানা গৃহযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মৌকা বুঝে শুরু করল যার যার নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠার লড়াই। ফলে দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধাঔপনিবেশিক অবস্থা আরো সংকটময় হয়ে উঠল।

ফলে লুশুনের স্বপ্ন ভাঙল অচিরে। একটা দীর্ঘ সময় কাল ধরে চলল তাঁর পথ খোঁজা। এক নিদারুণ যন্ত্রনায় জীর্ণ হলেন তিনি, চারদিক যেন অন্ধকার। এই অন্ধকারে দেশের মুক্তির পথ খুঁজে চললেন লুশুন। জাপান প্রবাস কালে ফিল্মে চীনা জনগণের যে নির্বেদ দেখেছিলেন, সে নির্বেদ মুছে ফেলতে হবে। চীনের মানুষকে জাগাতে হবে।

তিন ॥

১৯১১ সালে ইউয়ান শি-কাই আবার চীনের রাজনীতি মঞ্চে এল। এই ইউয়ান ১৮৯৮ সালে শাসন সংস্কার আন্দোলনে বিরোধিতা করেছিল। যখন সে শানটুং-এর গভর্নর, তখন প্রথম দিকের ই হো তুয়ান আন্দোলন নির্মম ভাবে দমন করেছিল। চিহ্‌লির ভাইসরয় লি হুং-চাং, ১৯০১ সালে মৃত্যুর আগে, এই ইউয়ানকে নিজের পদে উত্তরাধিকারী, আর সেই সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী, দুটি পদ দেবার জন্যে সম্রাটের অভিভাবিকার কাছে সুপারিশ করেছিল।

উচাং অভ্যুত্থানের আগেই মাঞ্চু সরকার তাকে পদচ্যুত করল। তবে সেনাবাহিনীতে তার অনেক সমর্থক ছিল আর মাঞ্চু বাহিনীতে ছিল সুগভীর প্রভাব। ১৯১১ সালে বিপ্লব শুরু হলে পরে মাঞ্চু

সরকার আবেদন জানায়, ইউয়ান যেন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে আর বিপ্লব দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়।

রাজনৈতিক আর সামরিক ক্ষমতা হাতে পাবার পর ইউয়ান উহান আক্রমণ করে ও হানইয়াং দখল করে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করল যে ইউয়ানই একমাত্র লোকের মত লোক। এ সংকটে চীনা সরকারকে যদি কেউ নেতৃত্ব দানে সফল হয় তো সে ইউয়ান। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের নামে কুৎসা ছড়াতে শুরু করে, বিপ্লব সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার চালায় আর বিপ্লবীদের গালিগালাজ দিতে থাকে।

ইউয়ান, রাজাকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করে। একই সঙ্গে, বিপ্লবের নেতাদের একটা আপস রফায় আসতে বাধ্য করল মাঞ্চু সেনার ভয় দেখিয়ে। ১৯১১ সালের নভেম্বরে বিপ্লবীদের সঙ্গে ইউয়ানের শান্তি স্থাপনের জন্য আলোচনা বৈঠক শুরু হল।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্রবাদী, জমিদার ও বুরোক্র্যাট, যারা এতদিন বিপ্লবী শিবিরে ঢুকে বসেছিল, তারা মৌকা বুঝে কাজে নেমে পড়ল। ইউয়ানের সামরিক শক্তি যথেষ্ট, ভয় ধরাবার মতই। তাই এরা ইউয়ানের সঙ্গেই ভিড়ে পড়ল যাতে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও পদগুলি ঠিকঠাক থাকে। ডাঃ সানকে এরাই, কথাবার্তা চালাবার সময়ে কিছুটা নরম হবার জন্যে চাপ দিতে থাকল। ওদিকে এই সময়েই আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী আর ফ্রান্স ইউয়ানকে তার আর্থনীতিক সমস্যা মেটাবার জন্যে ধার দিতে থাকল। শান্তি-প্রস্তাবের আলোচনায় ক্রমশ ইউয়ানের দিকেই পাল্লা ঝুঁকে পড়ল।

ডাঃ সান তো সৎ বিপ্লবী। চীনের স্বার্থই তাঁর স্বার্থ। তাঁর ভয় হল, বুঝি বা দেশ ভাগ হয়ে যায়। যা করলে পরিণামে দেশ ভাগ অবশ্যম্ভাবী, সে কাজ তো করা চলে না।

তিনি ঠিক করলেন যে ইউয়ানকেই প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেবেন। তবে শর্ত থাকল, যে

(১) ইউয়ান মাঞ্চু সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে ; আর

(২) কায়মনে প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করবে ; আর

(৩) অন্তবর্তীকালীন সংবিধানটি মেনে চলবে।

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাঞ্চু রাজবংশ সিংহাসন ত্যাগের কথা ঘোষণা করল। অন্তবর্তীকালীন অ্যাসেমব্লির কাছে ডাঃ সান তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন। অ্যাসেম্ব্লি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করল। ইউয়ানকে নির্বাচিত করল তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে।

যা হবার নয়, তাই হল। সরে গেলেন মহান বিপ্লবী ডাঃ সান। আর প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধবাজ ইউয়ান মীরজাফরী কৌশলে রাতারাতি মাঞ্চু সরকারের প্রধান মন্ত্রী পদ থেকে হয়ে গেল প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেণ্ট। ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফসল এভাবেই গিয়ে উঠল ইউয়ানের গোলায়।

ইউয়ান সরকার গঠনের পর পরই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রবাদীরা, ব্যুরোক্র্যাট-রাজনীতিবিদ ও তুং মেং হুই-এর কিছু সদস্যদের সহযোগিতায় তিনটি পার্টি গড়ল। যথা,

(১) তুং ই তাং, বা ঐক্যবদ্ধতার পার্টি ;

(২) কুং হো তাং, বা প্রজাতন্ত্রী পার্টি ;

(৩) মিন চু তাং, বা গণতন্ত্র পার্টি।

১৯১২ সালের আগস্টে হুয়াং শিং, সুং চিয়াও-জেন আর তুং মেং হুই-এর কিছু প্রগতিশীল সদস্য মিলে তুং মেং হুইকে, "কুওমিণ্টাং" নামে পুনর্গঠিত করলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান ও জাতীয় অ্যাসেমব্লির সহায়তায়, অথবা সাংবিধানিক লড়াইয়ের সাহায্যে ইউয়ানের ক্ষমতাকে সীমিত রাখাই উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত কুওমিনটাং-এর।

এর পালটা হিসেবে ইউয়ান ঐক্যবদ্ধতার, প্রজাতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী, তিনটে পার্টিকে হাত করে ফেলল। সে তিনটেকে মিলিয়ে চিন প্ তাং, বা প্রগতিশীল পার্টি নামে একটা দল গড়ল। এ তার নিজের

পার্টি, কুওমিনটাং-এর প্রতিপক্ষ। পরে চক্রান্ত করে ইউয়ান সুং চিয়াও জেনকে খুন করাল। ফলে সংকট তীব্রতর হয়।

১৯১৩ সালে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান ও রাশিয়া এক পঞ্চশক্তি সংঘ গড়ল। আর প্রতিক্রিয়াশীল ইউয়ান সরকারকে মদত দেবার জন্যে মোটা টাকা ঋণ দিল। ইউয়ানও এই ঋণ পাবার জন্য, শর্ত হিসেবে চীনের অর্থনীতিকে পঞ্চশক্তি সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবে বলে কথা দিল। ইউয়ান এই ঋণ মুখ্যত নেয়, তার ফৌজ বাড়াবার জন্যে আর সারা দেশে তার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা জোর করে চালাবার জন্যে।

ইতিমধ্যে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন জেনে ফেলেছেন ইউয়ানের আসল চেহারাখানা। চীনা জনগণের এত সাধের বিপ্লব, চীনা রক্তে অর্জিত বিপ্লব, তা কি এমনি করে ব্যর্থ হবে? ইউয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান চালাবেন বলে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্রবাদীদের সমর্থন পেয়ে, সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া বিশাল অঙ্কের ঋণের টাকার গদীতে বসে ইউয়ান শি-কাই মদমত্ত হয়ে উঠল। সে কুওমিনটাং ফৌজকে দক্ষিণ চীনের প্রদেশগুলি, বিশেষ করে কিয়াংসি, আনহোয়েই ও কোয়াংটুং থেকে মুছে ফেলতে চাইল। ১৯১৩ সালের জুন মাসে সে ওই তিন প্রদেশের কুওমিনটাং বিপ্লবী গভর্নরদের পদচ্যুত করল।

কিয়াংসির গভর্নর লি লিয়ে-চুন পদত্যাগ করতে রাজী হলেন না। তাঁর ফৌজকে হুকৌ অধিকার করতে হুকুম দিলেন। তিনি এক "পিটুনি ফৌজ" গড়লেন আর ইউয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সারা দেশকে ডাক দিলেন।

কিয়াংসু, আনহোয়েই, কোয়াংটুং, ফুকিয়েন, হুনান ও জেচুয়ান, এসব প্রদেশের গভর্ণররা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

লি লিয়ে-চুনের ফৌজ যেমন শক্তিশালী, তিনি নিজেও তেমনি

দুর্ধর্ষ। ফলে তিনিই হলেন ইউয়ানের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। ইউয়ানের ফৌজ কিয়াংসি ঢুকল, হুকৌ দখল করে নানচাং কেড়ে নিল। লি লিয়ে-চুন ভীষণ ভাবে হেরে গেলেন।

ফলে বহু প্রদেশের গভর্ণররা আত্মসমর্পণ করল। দুই মাসের মধ্যে ইউয়ান-বিরোধী শক্তিগুলি সম্পূর্ণ হেরে গেল ও বিফল হল তাদের বিদ্রোহ। ইউয়ানের বিরুদ্ধে এই অভিযান দ্বিতীয় বিপ্লব নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় বিপ্লবের ব্যর্থতার পর ইউয়ানের উচ্চাশা আকাশকে ছুঁল। আগে সংবিধান গঠিত হবে, তার পরে প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হবে, সংবিধানের এ নিয়ম সে সরাসরি ভাঙল।

১৯১৩ সালের ৬ই অক্টোবর, তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার জন্যে সে পার্লামেন্টের সদস্যদের চাপ দিল। নির্বাচনের দিনে ইউয়ান কয়েক হাজার ভাড়াটে গুণ্ডাকে "নাগরিক সমিতি" নামের আড়ালে পার্লামেন্ট ভবনের চারদিকে মোতায়েন করল। পার্লামেন্টের সদস্যদের এই ভাড়াটে গুণ্ডারা শাসানি দিয়ে রেখে দিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সদস্যরা নির্বাচনী কক্ষ ছেড়ে বেরোতে পারল না। এমন সব বেইমানী ষড়যন্ত্র করে তবে ইউয়ান প্রেসিডেন্টের আসনটি ছিনিয়ে নিল।

ইউয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার খবর ঘোষণা হলে পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সবার আগে তাকে স্বীকৃতি দিল। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও আমেরিকাকে অনুসরণ করল। এদিকে, ইউয়ানের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে দেখে, সে ক্ষমতা খর্ব করার জন্যে কুওমিনটাং-এর পার্লামেন্ট সদস্যরা আর প্রোগ্রেসিভ পার্টির কিছু সদস্য সংবিধানের নজীর খাড়া করলেন। ফলে ইউয়ান, কুওমিনটাং পার্টিকে নিষিদ্ধ করল, ওই দলীয় সদস্যদের জাতীয় অ্যাসেম্ব্লি থেকে বের করে দিল।

১৯১৪ সালে ইউয়ান নিজের সংবিধান জারি করল। তার আগেই

নানকিংয়ে বিপ্লবী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সে সময়ে যে খসড়া-সংবিধান রচনা করেছিল, তা ইউয়ান বাতিল করে দিল। ১৯১১ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ চিহ্নটুকুও এমনি করেই মুছে গেল।

এই নতুন সংবিধান বলে প্রেসিডেন্ট, যে কোন সম্রাটের মত এক-নায়কতন্ত্রীয় অধিকার পেয়ে গেল। প্রেসিডেন্টের কর্মকাল কবে শেষ হবে তার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকল না। মৃত্যুর আগে নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাবার ক্ষমতা পেল প্রেসিডেন্ট। এখন সংবিধানের অনুমোদনে ইউয়ানই আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট থাকবেনা, তার ছেলেরও অধিকার থাকবে তার আসনে বসবার। ইতিমধ্যে অবশ্য ইউয়ান জমিদার ও বুর্জোয়াদেরও একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতা দিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করেছিল।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে ইউরোপে লেগে গেল সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বযুদ্ধ। জাপান এ সুযোগ হারাল না। ঝটপট সে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। শানটুং উপকূলে ফৌজ নামিয়ে দিয়ে জার্মানীর হাত থেকে জাপান কিআওচৌ-ৎসিনাম রেলপথ আর ৎসিংগতাও ছিনিয়ে নিল।

এ সময়ে, আবার রাজতন্ত্রের শাসন ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে ইউয়ান ব্যস্ত ছিল। এ ব্যাপারে সে রাজতন্ত্রী জাপানের সমর্থন পেল। ফলে জাপান যখন চীনের মাটির দখল নিল, ইউয়ান এতটুকু বাধা দিল না।

১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে জাপান তার কুখ্যাত একুশ দফা দাবী জানাল। এ দাবী মানলে চীন পর্যবসিত হয় জাপানের উপনিবেশে। ইউয়ান নিজেকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করতে চায়। জাপান সে পরিকল্পনা সমর্থন করেছে। সেই সমর্থনের শর্ত হিসেবে একুশ দফা দাবী মেনে নেবার জন্য ইউয়ানকে জাপান চাপ দিতে লাগল।

একুশ দফা দাবীর প্রধানগুলি হল যে চীনা সরকার—

(১) শানটুংয়ে জার্মানীর অধিকারগুলি জাপানকে দিয়ে দেবে আর শানটুংয়ের মুখ্য বন্দর ও শহরগুলি খুলে দেবে জাপানের সামনে ;

(২) লিয়াওনিং, কিরিন আর অন্তর্মংগোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে জাপানের বিশেষ সুবিধাধিকার স্বীকার করে নেবে ;

(৩) জাপানের সঙ্গে যুক্ত ভাবে হুপে-তে হ্যানিয়েহ্‌পিং লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আর কিয়াংসিতে শিংসিয়াং কয়লাখনি পরিচালনা করবে ;

(৪) জাপান ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে চীন উপকূলের কোন বন্দর, উপসাগর বা দ্বীপ ইজারা দেবে না ;

(৫) জাপানী রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামরিক পরামর্শদাতা নিয়োগ করবে ;

(৬) চীনের প্রধান প্রধান শহরের পুলিশ-বিভাগ জাপান ও চীনের যুক্ত প্রশাসনাধীনে রাখবে ;

(৭) অস্ত্রাগারগুলি রাখবে দুই দেশের যুক্ত পরিচালনাধীন ;

(৮) উচাং থেকে নানচাং, নানচাং থেকে হ্যাংচৌ, নানচাং থেকে কোয়াংটু-এর চাওচৌ পর্যন্ত রেলপথে টাকা বিনিয়োগের অধিকার দেবে জাপানকে ;

(৯) ফুকিয়েনে রেলপথ নির্মাণের ও খনিমালিকানার অধিকার দেবে জাপানকে।

ইউয়ান শি-কাই সব দাবীই প্রায় মেনে নিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও ইউয়ানের বেইমানী সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির বিক্ষোভ এর ফলে জেগে উঠল। ব্যাপকভাবে জাপানী জিনিস বয়কট করা চলল। জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের দৃঢ় প্রতিবাদের এক ভাষা এই বয়কট কার্যক্রম।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন বিষয়ে ভরসা পেয়ে ইউয়ান তোড়জোড় শুরু করল রাজতন্ত্র পুনর্বাসনের। চীনের অবস্থা বিচারে প্রজাতন্ত্রের চেয়ে রাজতন্ত্র যে চীনের পক্ষে বেশী উপযোগী, এই মর্মে

প্রবন্ধ লিখতে বলল তার মার্কিন পরামর্শদাতা ফ্র্যাঙ্ক জে. গুডনাওকে। তারপর, এক গণভোটের সিদ্ধান্ত পালনের জন্য, ইউয়ানের কর্তৃত্বাধীনে এক "নাগরিক সম্মেলনের" আয়োজন হল। ফলে প্রজাতন্ত্রের জায়গায় এল রাজতন্ত্র আর ইউয়ান হল সম্রাট।

ইউয়ানের সম্রাট হবার পরিকল্পনায় চীনের সকল মানুষ প্রতিবাদের ঝড় তুলল। ডাঃ সান ছিলেন জাপানে। তিনি চীনা বিপ্লবের জন্য কমরেডদের একজোট করলেন। ইউয়ানের শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সংগঠনের জন্য তিনি টোকিওতে চুং হুয়া কেহ্ মিং তাং, বা চীনা বিপ্লবী দল গড়লেন ১৯১৪ সালে। এই নব সংগঠিত পার্টি বৃহত্তর জনগণকে সংগঠিত করার কাজে ব্যর্থ হয়।

জনগণের ইউয়ান বিরোধী মনোভাবের সুযোগটা ঝটপট নিয়ে নেয় প্রোগ্রেসিভ পার্টির কিছু সদস্য এবং "জাতির মুক্তির জন্য প্রচারাভিযান" শুরু করলেন।

১৯১৫ সালের শেষাশেষি য়ুনানের এক সামরিক কমাণ্ডার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং জাতির মুক্তি ফৌজকে সংগঠিত করলেন ইউয়ানকে শাস্তি দেবার জন্য। এই অভ্যুত্থান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য প্রদেশে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ইউয়ানকে সমর্থন প্রত্যাহার করল।

১৯১৬ সালে সিংহাসনে উপবেশন ব্যাপারটি "বাতিল" বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হল ইউয়ান। ইউয়ানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানগুলি বাড়তে থাকল, ছড়াতে থাকল। এমন সময়ে ইউয়ান মারা গেল। তার উচ্চাশাতেও পড়ল যবনিকা।

ইউয়ান মারা গেলে পরে লি ইউয়ান-হুং হল প্রেসিডেন্ট এবং তুয়ান চি-জুই হল তার প্রধান মন্ত্রী। অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান তখনকার মত পুনর্বাসিত হল।

তুয়ান আগে ছিল ইউয়ানের সরকারে এক প্রভাবশালী সামরিক জেনারেল। ইউয়ান যখন প্রেসিডেন্ট, তখন তুয়ান বেশ কিছুকাল

ফৌজের সর্বসেনাধ্যক্ষ ছিল। ইউয়ানের মৃত্যুর পর তুয়ানের হাতে প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতা বর্তাল।

১৯১৭ সালের বসন্তকালে জাপানের নির্দেশে তুয়ান জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এবং ইউরোপ মঞ্চে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে অংশ নিতে যায়।

চীনকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবার ব্যাপারে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরাও জাপানের প্রতিযোগী। এই উদ্দেশ্যে তারা লি ইউয়ান-হাংকে কাজে লাগাল। বিশ্বযুদ্ধে চীনের যোগদান ব্যাপারে তুয়ানের যে প্রস্তাব, লি যেন তার বিরোধিতা করে।

পার্লামেণ্টের সমর্থনে লি, তুয়ানকে পদচ্যুত করল। তুয়ান হার মানল না। সে বিভিন্ন প্রদেশের জঙ্গী সেনাপতিদের উশকানি দিল। বলল, তারা যেন লি-কে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিতে বাধ্য করে।

এরই মধ্যে জঙ্গী সেনাপতি চ্যাং শুন পিকিংয়ে ঢুকল তার ফৌজ নিয়ে। সে লি ইউয়ান-হাং-কে প্রেসিডেণ্টের আসন থেকে তাড়াল আর সিংহাসনচ্যুত বালক মাঞ্চু সম্রাট শুয়ান তুংকে আবার বসাল চীনের সিংহাসনে অনেক কলকাঠি নেড়ে।

এ পরিস্থিতির সুযোগ ঝট করে নিয়ে নিল তুয়ান। সে তার ফৌজকে হুকুম দিল চ্যাং শুনকে আক্রমণ করতে। নিজে আবার হল প্রধান মন্ত্রী আর দাবী জানাল যে সে হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের রক্ষাকর্তা। তারপর সে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

এটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা তখন জার্মানীর সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছে। চীনের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হতে তারা পারল না।

জাপান কি এ সুযোগ ছাড়ে? তুয়ানকে মোটা টাকা ঋণ দিয়ে সে তুয়ান-সরকারকে রেখে দিল হাতের মুঠায়। ঋণের প্রতিদানে তুয়ান চীনের রেলপথ, খনি ও ব্যাঙ্ক জাপানকে বেচে দিল। ইউয়ান শি-কাইয়ের মত তুয়ানও হয়ে গেল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল।

কেন সে দালাল হল? সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনকে দখলে রাখতে চায়। এ কাজে কোন জাপানী নয়, একজন চীনা দালাল দরকার।

প্রধানমন্ত্রীর আমলে ফিরে এসে তুয়ান প্রজাতন্ত্র সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান বাতিল করে দিল। সে,

(১) পূর্বের সংবিধান বাতিল করল।

(২) পার্লামেন্টের সংগঠন সংক্রান্ত আইন আর নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করল।

(৩) নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এমন এক পার্লামেণ্ট গঠন করল। এর ফলে,

(১) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলি এক-ঐক্যে বিরোধিতা জানাল।

(২) কোয়াং তুং, কোয়াংসি ও ইউনানের নেতারা স্ব-স্ব প্রদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করল।

ডাঃ সান তখন সাংহাইয়ে। তিনি তুয়ান-শাসন খতম করার জন্য প্রস্তুতি গঠনের ভার নিলেন। নৌ-মন্ত্রী চেং পি-কুয়াং তারবার্তায় ডাঃ সানকে তাঁর সমর্থন জানালেন। ২৯।৭।১৯১৭ তারিখে ডাঃ সান এক নৌবাহিনী নিয়ে কোয়াংতুং গেলেন। দক্ষিণ প্রদেশগুলির নেতাদের সংগঠিত করলেন তিনি। উদ্দেশ্য এক সামরিক-সরকার গঠন, যাতে তিনি হবেন জেনেরালিসিমো। ইতিহাসে এ অভিযান "সংবিধানকে উঁচুতে তুলে ধরার অভিযান" নামে খ্যাত।

দক্ষিণ প্রদেশগুলির জঙ্গী সেনাপতিদের উপর সব ভরসা রেখেছিলেন ডাঃ সান এ সংগ্রামে। তবে ওই যুদ্ধবাজরা সংবিধান সমর্থনে লড়তে আগ্রহী ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল। শীঘ্রই ডাঃ সান হেরে গেলেন ও তাঁর অন্দোলন বিফল হল।

যখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল, তখন ইউরোপীয়ান শক্তিগুলি যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় চীনে তাদের কাজকর্মে কিছুটা ঢিলেমি দেখা গেল। ফলে চীনের জাতীয় পুঁজিবাদ দ্রুত বেড়ে ওঠে।

১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে চীনা মালিকানার কাপড়ের কলের চেহারা পালটে যায়।

১৯১৩	১৯১৯	অনুপাত বৃদ্ধি
মাকু		
৬,৫০,০০০	১১,৭০,০০০	৮০%
তাঁত		
৪,৬০০	৯,৪০০	১০৫%

এমনি হারে বেশি সংখ্যায় ময়দা কলও বাড়ে। আগে চীন ময়দা আমদানি করছিল। ১৯১৯ সালে চীন ময়দা রপ্তানি করতে শুরু করে। তুলনামূলক ভাবে অমসৃণ সিল্‌ক, সিগারেট, দেশলাই, রঞ্জক দ্রব্য ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়।

জাপান ও আমেরিকা অবশ্য চীনে আর্থনীতিক অনুপ্রবেশ চালিয়ে যাওয়া ছাড়েনি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে জাপানী মালিকানায় কাপড়ের কলের চেহারাটা দেখা যাক।

১৯১৪	১৯১৯	অনুপাত বৃদ্ধি
মাকু		
২,৩০,০০০	৪,৫০,০০০	৯৫%
তাঁত		
৩,৫০০	৪,৩০০	প্রায় ২৩%

জাতীয় পুঁজিবাদের উন্নতি কিন্তু সরলরেখায় এগোয়নি। দ্রুত উন্নতি হয়েছিল প্রধানত হালকা শিল্পে। তা বিশেষ করে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শাংহাই, তিয়েনৎসিন, ৎসিংতাও, উহান প্রভৃতি বড় শহরগুলিতে।

জাতীয় পুঁজিবাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চীনের প্রলেতারিয়েতরাও সংখ্যায় বাড়ছিল। জাতীয় অথবা বিদেশী প্রত্যেকটি নতুন শিল্পোদ্যোগ এদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলছিল। চীনের শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ১৯১৩ সালে ৬,৫০,০০০ থেকে বেড়ে ১৯১৯ সালে বিশ লক্ষের বেশিতে দাঁড়ায়।

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত শাসন ও পুঁজিবাদ, তিন শোষণের তিন জোয়াল কাঁধে বইত চীনের শ্রমিক। দীর্ঘ সময় কাজ করে তারা যে মজুরি পেত, তাতে কোন মতে শুধু টিকে থাকা চলে। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল অতি কদর্য, দুর্দশাগ্রস্ত। শিশু ও নারী শ্রমিককে নিয়োগ করার ব্যবস্থা ব্যাপক হারে সাধারণভাবে চালু ছিল।

পুঁজিবাদীরা ইচ্ছেমত শ্রমিকদের মারধর করতে ও মজুরি কেটে নিতে পারত। মেহনতী মানুষকে শোষণের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনের শাসক শ্রেণী ছিল একতাবদ্ধ। শ্রমিকদের তরফে প্রতিবাদ উঠলে তারা হাতে হাত মিলিয়ে নির্বিচারে শ্রমিকদের খুন করত।

জীবন যাত্রা কিছুটা উন্নত করার জন্য, চীনের প্রলেতারিয়েতরা জন্ম থেকেই লড়ছেন। এমন কি ১৯১১-র বিপ্লবেরও আগে কিয়াংসির আনয়ুআন কয়লাখনির খনিমজুরেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯১৩ সালে হানইয়াং অস্ত্রকারখানার শ্রমিকেরা মজুরি-কমানোর বিরুদ্ধে হরতাল করেন। ১৯১৫ সালের পর থেকে ধর্মঘটের সংখ্যা বেড়ে যায়। শুধু ১৯১৯ সালেই ছেষট্টিটি ধর্মঘট হয়। তাতে যোগদানকারী শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়ে যায়। তবে তখনো মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী তত্ত্ব শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। উন্নত বিপ্লবী তত্ত্বের নির্দেশ বা পথপ্রদর্শন এঁরা পাননি। তাই এই সংগ্রামগুলির চরিত্র ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং আর্থনীতিক দাবী দাওয়া ভিত্তিক।

প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটল বলে এক বিপ্লবী সর্বহারা পার্টি গড়ে ওঠার পথ তৈরি হল। সে পার্টি হল চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জাতীয় পুঁজিবাদের দ্রুত বৃদ্ধির সময়কালে বুর্জোয়া রাজনীতিক ও আর্থনীতিক তত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করল। ফলে জনগণ প্রচণ্ড ভাবে সামন্তবাদের বিরোধিতা করল। তাদের বুদ্ধি ও মনন চেতনা জেগে উঠল। এই জাগরণের খবর মিলল নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। এ আন্দোলনের কাজ সেই জনগণই করল, যারা প্রবলভাবে সামন্তবাদ বিরোধী।

১৯১৫ সালে একদল পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শিন চিং নিয়েন বা নতুন যৌবন নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সিধা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে তাঁরা দাঁড়ালেন গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান উন্নয়নের সপক্ষে দাঁড়ালেন। বাতিল করে দিলেন সামন্তবাদী স্বৈরতন্ত্র, সামন্তবাদী রীতিনীতি ও নীতিবোধ, সামন্তবাদের হাতিয়ার কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র কুসংস্কার, অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ। এসবেরও বিরোধিতা করলেন তাঁরা।

নতুন বিপ্লবী তত্ত্বের ধারণা ছড়িয়ে দেবার জন্য এঁরা এক নতুন সাহিত্য, সহজ সরল দেশজ ভাষা ও রীতিতে লেখার সপক্ষে বললেন। বিরোধিতা করলেন সামন্তবাদী সাহিত্য ও কট্টর ধ্রুপদী লিখন শৈলীর। অর্থাৎ, নতুন সাহিত্য চাই। সময়ের প্রয়োজনে সকলকে বিপ্লবী তত্ত্ব বুঝাবার জন্য চাই এক নতুন সাহিত্য। সে সাহিত্য এমন ভাষা ও স্টাইলে লিখতে হবে যে সবাই যেন তা বুঝতে পারে। কট্টর ধ্রুপদী ভাষা ও স্টাইলে লিখলে তা সামান্য কয়েকজন বুঝবে। তাতে নতুন সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

এই আন্দোলন চলার সময়ে কিছু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ ভাষা ও স্টাইলে কিছু প্রবন্ধ লিখলেন। সে সব প্রবন্ধে চীনের যুবশক্তিকে আহ্বান জানানো হল। তারা যেন নিজেদেরকে সংস্কার করে ঢেলে সাজে; প্রগতিশীল ও আন্তর্বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে; মনকে বেড়ি পরিয়ে রাখার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা যেন ভেঙে ফেলে; জাতিকে সামন্তবাদের স্তর থেকে গণতন্ত্রে উত্তরিত করে।

নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন গভীর ভাবে প্রভাবিত করল বুদ্ধিজীবীদের। ফলে তাঁরা প্রচার চালালেন সামন্তবাদের বেড়ি ভেঙে ফেলার সপক্ষে। পশ্চিমের বিজ্ঞান ও জীবন বিষয়ক তথ্য নিয়ে প্রবল উদ্যমে পড়াশুনা শুরু করলেন।

নয়া সংস্কৃতির এক উদ্গাতা চেন তু-শিউ দুর্ধর্ষ সাহসিকতায় আক্রমণ করলেন চীনের সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্তবাদী

সংস্কৃতিকে। দীপ্ত আবেগে প্রচার করলেন পশ্চিমী গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের কথা। চীনের সাংস্কৃতিক চেতনায় তাঁর প্রচেষ্টার গভীর প্রভাব পড়ল। চীনের যুবশক্তিকে তিনি আহ্বান জানালেন। তারা জড়, রক্ষণশীল ভাবধারার আবর্জনা বর্জন করুক। তার জায়গায় গ্রহণ করুক সেই প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা সামনে তাকাতে, এগিয়ে যেতে বলে।

চেন বিরোধিতা করলেন সামন্ততন্ত্রী স্বৈরতন্ত্র ও জঙ্গী সমর নায়কদের শাসনের। চীনকে এক বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে দেখবেন, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তবে চেন, দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে, বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার জন্য সংগঠিত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি এক ভুল স্বপ্ন লালন করছিলেন। তা হল, শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়াই চীনে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯১৭ সালে চেন তাঁর "সাহিত্য বিপ্লব প্রসঙ্গ"-তে লেখেন।

"আমার বন্ধুর মুক্তির জন্য "সাহিত্যিকদের বিপ্লবী ফৌজ"—এর ঝাণ্ডা উঁচুতে তুলে ধরতে গিয়ে আমাকে যদি সারা দেশের বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতদের শত্রুতার ঝুঁকি নিতে হয়, আমি তা নিতে রাজী আছি।

আমাদের ঝাণ্ডার ওপর বড় বড় করে লেখা আছে এই বিপ্লবী ফৌজের উদ্দেশ্য ও মতবাদ। তা হল,

(১) অভিজাতদের শিষ্ট ও কুলীন সাহিত্য নিপাত দিয়ে জনগণের সহজ সরল গীতিকবিতাধর্মী সাহিত্য প্রবর্তন।

(২) ধ্রুপদী রীতির রংচড়ানো অকেজো সাহিত্যকে উচ্ছিন্ন করে এক নতুন আন্তরিকতা পূর্ণ বাস্তবতার সাহিত্য প্রবর্তন।

(৩) পর্বতকুঞ্জ নিবাসী যে সাহিত্য অক্ষম, জ্ঞান ও চেতনার পথে জগদ্দল বাধা, যা কয়েকজনের জন্য, তার বদলে এক সাদামাটা জনপ্রিয় সামাজিক সাহিত্য প্রবর্তন।"

এর প্রায় দশ বছর বাদে ১৯২৬ সালের "বিপ্লব বনাম সাহিত্য"

প্রবন্ধে সমকালীন সাহিত্যসংস্থা "সৃষ্টি শীল সমিতি"-র অন্যতম প্রধান কুয়ো মো-জো লেখেন, তরুণগণ। পরিবেশ আর সময় যখন এরকম, তোমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় লেখক হওয়া, না হলে অবশ্য সে কথা আলাদা,—তাহলে দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে টান লাগে, তেমনি করে পরিশ্রম করে এই সময়ের মর্মবাণী বুঝে তার নাগাল পেতে হবে। আমি তোমাদের জন্য, সকল জনগণের জন্য চাই যে তোমরা প্রত্যেকে বিপ্লবী লেখক হও, রণক্ষেত্রত্যাগী হোয়ো না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। তোমাদের এ কথা ভাবা উচিত নয় যে কয়েক পেয়ালা মদ্যপানই রোমান্টিকতার মর্মসার, অথবা কিছু জটিল কবিতা লিখলেই তুমি এক প্রতিভাবান কবি। তার বদলে তোমাদের উচিত বলিষ্ঠ ভাবে জীবনগঠন, সাহিত্যের সংঘারামগুলি বর্জন। তোমাদের যাওয়া উচিত ফৌজে, জনগণের মধ্যে, কারখানার মধ্যে, বিপ্লবের ঘূর্নিপাকের ভেতরে। তোমাদের বুঝতে হবে যে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সমব্যথী সমাজতান্ত্রিক, বাস্তববাদী সাহিত্যই আমাদের প্রয়োজন। সারা দুনিয়ার এ দাবীর সঙ্গে আমাদের দাবীও এক হয়ে গেছে। সকল চেষ্টায় নির্ভয়ে এগোবার জন্য আমাদের নিজেদেরকে উদ্যমী হতে হবে।

নয়া সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা লি তা-চাও পুরোপুরি এক বৈপ্লবিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ডাক দেন। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বললেন, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হল সাম্রাজ্যবাদ। যতক্ষণ না, যতদিন না সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুনিয়া থেকে উৎখাত হচ্ছে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার কখনো টিকতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে সামন্তবাদ-বিরোধী লড়াইকে মিলিয়ে দিয়ে লি পুরো আন্দোলনটিকে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বে পৌঁছে দিলেন।

আন্দোলনের অন্য এক লেখক হু শি ১৯১৭ সালে লেখেন,

"এ মডেস্ট প্রোপোজাল ফর দি রিফর্ম অফ লিটারেচার।" একে বলা হয় বিপ্লবীদের ম্যানিফেস্টো। তাঁর বক্তব্য ছিল, যে সাহিত্যরচনা-রীতি জরাজীর্ণ, আদ্যিকেলে বাগরীতি—দুর্বোধ্য বক্তব্য—বিরক্তিকর প্রকাশ-ভঙ্গি ও বাগাড়ম্বরে বোঝাই, তার জায়গায় আধুনিক কথ্য ভাষায় সাদাসিধা বলিষ্ঠ স্টাইলে সাহিত্য-রচনা হোক।

তিনি লিখেছেন, এই জন্যেই গদ্য ও কবিতা লেখার সময়ে আমি কথ্য ভাষার শব্দ ও বিশেষ প্রয়োগগুলি ব্যবহার করার কথা বলি। তিন হাজার বছর আগেকার নিষ্প্রাণ শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রাণবন্ত শব্দ ব্যবহার করা অনেক ভাল। বহুল পঠিত "টেল অফ দি মার্শেস" ও "জার্নি টু দি ওয়েস্ট" বইগুলির ভাষা অনুসরণে লেখা অনেক ভালো চিন, হান ও ছুয় রাজবংশ সময়কালের ভাষায় লেখার চেয়ে। এগুলি এখন চলেও না! এর কোন জনপ্রিয়তাও নেই।

তারুণ্যদীপ্ত যোদ্ধার মত আবেগে হু শি অন্য সব প্রবন্ধে প্রাচীন ঐতিহ্যের চীনা সাহিত্যকে বলেছেন মৃত সাহিত্য। সেই মৃত সাহিত্যের সমাধির ওপর নতুন যুগের জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করতে বলেছেন।

চৌ সু-জেন এসময়েই গ্রহণ করলেন তাঁর ছদ্মনাম লু-শুন। লিখলেন তাঁর প্রথম অবিস্মরণীয় গল্প "জনৈক উন্মাদের রোজনামচা।" ১৯১৮ সালের মে মাসে "নতুন যৌবন" কাগজে গল্পটি বেরোল। তখন তিনি পিকিংয়ে শিক্ষকতা করছেন। প্রখ্যাত রুশ লেখক গোগোলের কাছ থেকে তিনি গল্পটির নামটি নেন। ওই নেয়া পর্যন্ত। কি গল্পটিতে, কি বিন্যাসে, গোগোলের ওই নামের গল্পের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। অন্য এক প্রেক্ষিতে এ অন্য এক কাহিনী।

সে সময়ের চীনা সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা লু শুনের গল্পে এক মানুষখেকো ব্যবস্থা। তিনি দেখালেন, কেমন করে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সমস্ত অধিকারকে গ্রাস করে নিচ্ছে। চীনা সাহিত্যে এটি হল প্রথম, সার্থক, সামাজিক প্রতিবাদের গল্প।

কনফুসীয় নীতিবোধকে লক্ষ্যস্থল হিসেবে আক্রমণ করেই উন্মাদটি তার রোজনামচা লিখছে, "আমার যতদূর মনে পড়ে, প্রাচীন দিনে মানুষ প্রায়ই মানুষ খেত। তবে সে বিষয়ে আমি কিছুটা অনিশ্চিত। তবে আমার ইতিহাসে কোন কালক্রম নেই আর প্রতি পাতা জুড়ে লেখা আছে "নৈতিক উৎকর্ষতা ও নৈতিকতা।" যা হোক ঘুমোতে যখন পারছিই না তখন অর্ধেক রাত অবধি খুব করে পড়তে থাকলাম যতক্ষণ না দেখতে পেলাম যে গোটা বইটা জুড়ে লাইনগুলোর মাঝ দিয়ে লেখা আছে, "মানুষ খাও।"

আধুনিক যুগের এই মানুষখেকোদের সম্পর্কে লু শুন তাঁর চরিত্রের মুখ দিয়ে শাণিত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, "তোমার নিজেকে বদলানো উচিত, একেবারে হৃদয়ের গভীরতম গভীর থেকে। তোমাকে জানতে হবে যে ভবিষ্যতে দুনিয়ায় মানুষখেকোদের কোন ঠাঁই থাকবে না।

যদি নিজেকে না বদলাও, তাহলে তোমরা সবাই পরস্পরকে হয়ত খেয়ে ফেলতে পারো। যদিও (তোমাদের) অনেকে জন্মাচ্ছে, সত্যিকারের মানুষরা তাদের মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে দেবে। যে ভাবে শিকারীর হাতে নেকড়ে মরে, ঠিক তেমনি করে। ঠিক পোকা-মাকড়ের মত।"

গল্পটি শেষ হয়েছে এক আন্তরিক আকাংক্ষায়, "হয়তো এখনো তেমন শিশুরা আছে যারা মানুষ খায়নি। শিশুদের বাঁচাও।"

১৯১৮ সালের মে মাস থেকে লু শুন "নতুন যৌবন" পত্রিকায় চাংশি ছদ্মনামে লিখে চললেন "স্বপ্ন" প্রভৃতি নতুন রীতির কবিতা। লিখলেন অনেক প্রবন্ধ। যেমন "মাই ভিউ অফ চেস্টিটি" প্রভৃতি। আর এ-বছরের শীতেই তিনি লিখলেন "কাং আই-চি" নামের গল্প।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালের নভেম্বরে (পুরণো রুশ ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী অক্টোবরে) বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক

মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয় লাভ করে পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে তারাই পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র।

এই বিপ্লব মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগ আনে। অক্টোবর বিপ্লবের জয় মানুষের ভাগ্যে এক নতুন পথনির্দেশ। পুরনো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ ও নতুন প্রলেতারীয়-সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের সূচনা।

অক্টোবর-বিপ্লবের সার্থকতার পর সোভিয়েট সরকার, চীনের সঙ্গে জারপন্থী রাশিয়ার সবগুলি অসম চুক্তি বাতিল করে দেয়। জারপন্থী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে যে সব বিশেষ সুযোগসুবিধা আদায় করেছিল, তা সোভিয়েট সরকার ছেড়ে দেয়। এর ওপর জাতীয় স্বাধীনতার জন্য চীনের সংগ্রামকে সমর্থনের সপক্ষে বলে সোভিয়েট সরকার। এই বন্ধুত্বপূর্ণ কাজগুলির ফলে চীনা জনগণ অচিরে বন্ধু হয় সোভিয়েটের।

চীনের ছিল পশ্চিম থেকে শিক্ষালাভের অত্যধিক উৎসাহ। অক্টোবর বিপ্লব একদিকে সেটা বন্ধ করল, অন্যদিকে চীনা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের পরিচয় ঘটাল। নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনেক নেতাই শুরু করলেন।

(১) মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করতে ;

(২) রুশবিপ্লবের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে ;

(৩) রাশিয়ার পথ অনুসরণ করতে।

১৯১৮ সালে লি তা-চাও প্রকাশ করলেন, "সাধারণ মানুষের জয়" ও "বলশেভিকবাদের জয়।" তাতে তিনি বললেন যে "১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব হল বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রদূত। ভবিষ্যতের দুনিয়া হবে লাল ঝাণ্ডার দুনিয়া।"

অক্টোবর-বিপ্লবের বিস্ফোরণই চীনে আনল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এক চিরন্তন সত্য এবং সর্বত্রই তা প্রয়োগ করা চলে সেটা চীনের জনগণ বুঝলেন। এখন চীন অন্য এক চেহারা নিতে

থাকল। চীনের জনগণ পুরনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর পেরিয়ে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে নয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে প্রবেশ করলেন।

১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধ থেকে ১৯১৯ সালের মে-চার আন্দোলনের আগের বছর পর্যন্ত হল সেই সময়। যখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসক ও সামন্তবাদী শাসকরা চীনকে নামিয়ে এনেছিল আধাঔপনিবেশিক আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশের স্তরে। এটা হচ্ছে ইতিহাসের সেই বিশেষ সময়, যখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার ও চীনা সামন্তবাদী শাসক শ্রেণীর নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার সাহসের স্বাক্ষর রাখে চীনের জনগণ, অক্ষুণ্ণ রাখে তাদের মহান বিপ্লবী ঐতিহ্য।

চার ॥

১৯১৮ সালে সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হল। পরের বছর পারীতে বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ও অন্যান্য বিদেশী শক্তিবর্গ এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই পারী শান্তি সম্মেলন ছিল দর কষাকষির আখড়া বিশেষ। এখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে লুটের মাল ভাগ করে নিল।

পিকিংয়ের তুয়ান চি-জুইয়ের জঙ্গী সরকার যেহেতু চীনকেও যুদ্ধে নামায় আমেরিকা ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচর হিসেবে, সেহেতু চীনও পারীসম্মেলনে প্রতিনিধিদল পাঠায়। চীনের জনমতের চাপে পড়ে এই প্রতিনিধিদল সম্মেলনে কয়েকটি দাবী পেশ করে। সেগুলি হল:

(১) সানটুংয়ে জার্মানী যে অধিকারগুলি ভোগ করত এবং

যুদ্ধকালে জাপান যেগুলি জার্মানীর দখল থেকে কেড়ে নেয়, তা চীনকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

(২) জাপান এবং ইউয়ান শি-কাই সরকারের মধ্যে যে "একুশ দফা দাবী" চুক্তি হয়েছিল, তা বাতিল করতে হবে।

(৩) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে বিশেষ অধিকারগুলি ভোগ করত চীনে, তাও বাতিল করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কারচুপির ফলে সম্মেলন এ দাবীগুলি খারিজ করে দেয়।

দাবীগুলি তো জঙ্গী সেনাপতি-সরকারের ছিল না, তা ছিল জনগণের দাবী। সেগুলি খারিজ হবার খবর চীনে পৌঁছে যেতে সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় উঠল। মে মাসের চার তারিখে পিকিং শহরের ছাত্র ও অধিবাসীরা বিক্ষোভ জানাতে তিয়েন আন মেন স্কোয়্যারে জড়ো হলেন। দেশাত্মবোধের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে তাঁরা স্লোগান দিলেন।

দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে দিও না! বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি চাই।

ৎসিংতাও পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

ভার্সাই চুক্তিতে কোন স্বাক্ষর নয়!

একুশ দফা দাবী বাতিল কর!

জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট কর!

বিক্ষোভকারীরা জাতির প্রতি বিশ্বাস ঘাতক তিন জনের শাস্তি দাবী করলেন। এই তিন বিশ্বাসঘাতক হলেন (১) যোগাযোগ মন্ত্রী ৎসাও জু-লিন। ইউয়ান শি-কাই সরকারে উপ-বৈদেশিক মন্ত্রী থাকার সময়ে ইনি "একুশ দফা দাবী" চুক্তিতে সই করেছিলেন। (২) কারেন্সি ব্যুরোর ডিরেক্টর-জেনারেল লু ৎস্যুং-উ। "একুশ দফা দাবী" চুক্তি সই করার সময়ে জাপান সরকারে ইনি ছিলেন চীনা মন্ত্রী। (৩) জাপান সরকারে সে সময়ে চীনা মন্ত্রী যিনি সেই চ্যাং

ৎসুং-শিয়াং। ইনি জাপানকে চীনের রেলপথে অধিকার একের পর এক বেচেছিলেন।

জনতা, সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে ৎসাও জু-লিনের বাড়িতে ঢুকে পড়েন ও চ্যাং ৎসুং-শিয়াংকে ধরে বেদম পেটায়। চ্যাং সেখানে লুকিয়েছিলেন। শেষমেশ তাঁরা ৎসাও-এর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন।

পিকিংয়ের জঙ্গী সেনানায়ক-সরকার এ বিক্ষোভ দমন করতে অবিলম্বে বিশাল বিশাল সেনাবাহিনী পাঠায় ও অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন পিকিং-এর ছাত্ররা এক সাধারণ প্রতিবাদ ধর্মঘট পালন করেন। শহরের মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে এঁরা তড়িঘড়ি সংগঠন করেন এক ছাত্র ফেডারেশন এবং সমগ্র জাতিকে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার বিলি করেন।

এ ডাকে অবিলম্বে সাড়া দিলেন তিয়েনৎসিন, সাংহাই, নানকিং, উহান, ক্যান্টন ও অন্যান্য শহরের ছাত্ররা এবং তাঁরাও সে সব শহরে বিশাল বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করলেন।

শানটুং, ৎসিনানে, জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কটের দাবীতে হাজার হাজার শ্রমিক সামিল হলেন। দেশপ্রেমের দুর্বার জোয়ারে সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠল।

জঙ্গী সেনানায়ক-সরকার দলে দলে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে চলল। জনগণ এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। উনিশশো সালের জুন মাসের তিন তারিখে সাংহাইয়ে জনগণের এক বিশাল মিছিল বেরোল। তাঁরা আহ্বান জানালেন ব্যবসা পত্র কাজকারবার মুলতবি থাকুক, কারখানা থেকে শ্রমিক সাধারণ বেরিয়ে আসুন।

দু দিন বাদে সাংহাইয়ের কুড়ি হাজার শ্রমিক এক ধর্মঘট ডাকলেন যার ফলে জাপানী মালিকানাধীন কাপড় কলগুলি সমেত অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। এর অনুসরণে যন্ত্রপাতি, সূতীবস্ত্র ও

মুদ্রণ শিল্পের শ্রমিকেরা পর পর অনেক ধর্মঘট করলেন। সাংহাইয়ের শ্রমিকদের জোরদার আন্দোলন সারা দেশের জনগণের মনে সংগ্রামী প্রেরণা যোগাল।

এই সময়ে, বলতে কি সমগ্র সময়টা জুড়ে তাংশান, পিকিংয়ের কাছে চ্যাংশিনতিয়েন, এবং তিয়েনৎসিনে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। নানকিং, হ্যাংচাও, কিউকিয়াং, উহান, আময়, ৎসিনান, আনকিং এ সব জায়গায় দোকানপাঠ বন্ধ থাকল। শানটুং, হোপেই, শানসি, কিয়াংসি, হুপেই এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিদল আর্জি নিয়ে পিকিংয়ে হাজির হলেন। তাঁদের দাবী, বিশ্বাসঘাতক "একুশ দফা দাবী" বাতিল করো, বাকস্বাধীনতা ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতা দাও। বুদ্ধিজীবীদের দেশাত্মবোধক সংগ্রামই বিখ্যাত মে-চার আন্দোলন। চীনা শ্রমিকদের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি সে আন্দোলনের সীমানা ছাড়িয়ে দিয়ে তাকে পরিণত করল জনগণের বৃহত্তর আন্দোলনে। এ আন্দোলন যে বিজয়মণ্ডিত হয়, তার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কারণ হল শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামী ভূমিকা।

জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত চলল। জনগণের চাপ এমন শক্তিশালী হয়ে উঠল, যে পিকিংয়ের জংগী সেনানায়ক সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। সরকার অবিলম্বে মুক্তি দিল বন্দী ছাত্রদের। বরখাস্ত করল বিশ্বাসঘাতক ৎসাও জু-লিন, লু ৎস্যুং-উ আর চ্যাং ৎস্যুং-শিয়াংকে। এর ওপর পারী সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিদল জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার না করে পারল না। ছুনিয়া কাঁপানো দেশাত্মবোধক মে-চার আন্দোলন চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নতুন, উজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত করল।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় চীনের নয়াসংস্কৃতি আন্দোলনের নেতাদের একাংশ মার্কসবাদের সত্য বিষয়ে

সচেতন হলেন। চীনের আদর্শবাদ-ক্ষেত্রে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী এলেন যাঁরা সাম্যবাদ বিষয়ে কিছুটা জানেন। ফলে আন্দোলন জোর কদমে এগোতে থাকল।

লি তা-চাও হলেন চীনা মার্কসবাদীদের একেবারে প্রথম যুগের অন্যতম পুরুষ। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও বটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ খুবই সঠিক। তিনি বললেন, এ এক অন্যায় যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যে যার দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে এ যুদ্ধ লড়েছে। তিনি আরো বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জয়লাভে এ যুদ্ধ শেষ হয়নি। শান্তি ও সমাজতন্ত্রবাদের শক্তিগুলি বিজয়ী হয়েছে। চীনের বুদ্ধিজীবী সমাজকে লি তা-চাওয়ের এ তত্ত্ব আঘাত হেনে কাঁপিয়ে দিল।

মার্কসবাদকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে লি তা-চাও নিয়মিত লিখে চললেন "নতুন যৌবন" পত্রিকায়। আর ১৯১৮ সালের শেষ দিকে চেন তু-শিউ এবং অন্যদের সঙ্গে পিকিং থেকে বের করতে থাকলেন "সাপ্তাহিক সমীক্ষা" নামে কাগজ। এই পত্রিকা চীনের জনগণের কাছে হাজির করল সোভিয়েট রাশিয়ার নয়া সংবিধান, রাশিয়ার কৃষি ও বিবাহ সংক্রান্ত আইন ও রাশিয়ার বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সম্ভার।

১৯১৯ সালের মে মাসে "নতুন যৌবন" পত্রিকা বিশেষ মার্ক্সবাদ সংখ্যা বের করে। তাতে লি তা-চাও "মার্ক্সবাদ আমি যেমন বুঝি" নামীয় একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে মার্ক্সীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন। মার্ক্সবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

মে-চার আন্দোলন, নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক সংগ্রাম, এই দুই প্রবহমান দেশভাসানো ধারার সঙ্গম ঘটাল। নয়া সংস্কৃতি সগৌরবে বিকশিত হল। সারা দেশ জুড়ে প্রকাশ হতে থাকল কাগজপত্র। এর মধ্যে ছিল হুনানে মাও ৎসে-তুং প্রতিষ্ঠিত "শিয়াংচিয়াং রিভিউ"; তিয়েনৎসিনে চৌ-এন-লাই

সম্পাদিত "বুলেটিন অফ দি স্টুডেন্টস ফেডারেশান" ও পিকিংয়ে "নিউ কারেন্ট" ; সাংহাইয়ে "সানডে রিভিউ ; হ্যাংচাও-তে চেকিয়াং রিভিউ" এবং চেংটুতে "সানডে।"

দেশাত্মবোধক মে-চার আন্দোলনের পর চীনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে মার্ক্সবাদ ও চীনে মার্ক্সবাদ বিষয়ে বই পত্তর প্রকাশ হতে থাকে। এই সময়েই চীনা ভাষায় প্রকাশ হয় "কম্যুনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো" ; "সমাজতন্ত্রবাদ : ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক।" মার্ক্স-বাদের আলোকে দীপ্ত হয়ে নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে লু শুন লেখেন "কুং আই-চি" ও মে মাসে প্রকাশিত হয় "ওষুধ" নামীয় গল্প। এ গল্প দুটিতেও লু শুন দেখান দেশের সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থায় কি ভাবে একজন মানুষ নির্মম ভাবে নিষ্পিষ্ট হয়, হয় নিহত। এই ব্যবস্থাকে পটভূমি হিসেবে রেখে তিনি সে পটভূমির ওপর এক বা একাধিক মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র আঁকেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি উদ্‌ঘাটন করেন সমকালীন চীনের সমাজ ব্যবস্থা, তার শোষণের রূপ।

লু শুন কখনো নীল চশমা পরে জীবন ও সমাজকে দেখেন নি। এমন কোন কল্পিত ছবি আঁকেন নি, যা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় সংগ্রাম থেকে, জীবনচেতনা থেকে। দেশ ও মানুষকে যে সাহিত্যিক ভালবাসেন, তিনি এই ভাবেই লিখবেন। এটাই সঠিক পথ, আর সবই ভুল। চীনের লক্ষ কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সব সময়ে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন লু শুন। সেই জন্যেই এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন।

এর আগে লেখা "জনৈক উন্মাদের রোজনামচা" গল্পে আমরা মহান মানবতাবাদী লু শুনকে দেখেছি। এখানে তিনি আপসহীন সততায় সামন্তবাদী ধারণা ও তত্ত্বকে আক্রমণ করেন। এক নিষ্ঠুর মানুষখেকো সমাজের দগদগে ছবি তুলে ধরেন। কেমন করে সে সমাজকে আক্রমণ করতে হবে সে বিষয়েও সঠিক ইংগিত দেন। কারণ ততদিনে তিনি

জেনে গেছেন যে সামন্তব্যবস্থাকে মূল শুদ্ধ উৎখাত করতে না পারলে এ সমাজের কোন মুক্তি নেই।

পরবর্তীকালে লু শুন এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, "কেন যে আমি এই গল্পগুলি লিখেছিলাম, সে বিষয়ে দশ বছর আগে যা মনে হয়েছিল, আজও তাই মনে করি; যে আমার লেখা উচিত দেশবাসীকে আলোকিতচেতন করব এই আশায়,—মানুষের জীবনের কথা লেখা উচিত,...আমাদের অস্বাভাবিক সমাজের হতভাগ্যদের মধ্য থেকে আমি আমার বেশির ভাগ চরিত্রকে বেছে নিয়েছি। কেননা আমি চেয়েছিলাম বিশেষ কিছু (সামাজিক) ব্যাধিকে উন্মোচন করতে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, ব্যাধিমুক্তি ঘটাতে।"

"জনৈক উন্মাদের রোজনামচা," "কুং আই-চি", "ওষুধ", এ সব গল্পগুলির মূল ভাবনা উপরের ওই কথাগুলিতেই স্পষ্ট। এ সব গল্পের মূল চরিত্রগুলি, উন্মাদটি, কুং আই-চি, জুন-তু, বুড়ো চুয়ান, সকলেই এক অস্বাভাবিক সমাজের হতভাগ্যের দল। এদের অসুখী অভিশপ্ত ভাগ্যের বিরুদ্ধে লু শুন দৃঢ় প্রতিবাদ জানান। যে সকল শক্তি এদের ওপর শোষণ চালায়, তাদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটন করে তিনি আক্রমণ চালান তাদের ওপর। আর একই সঙ্গে তিনি ভাগ্যহীন বঞ্চিতদের আশা আকাঙ্ক্ষা, দাবী, অন্তর্নিহিত শক্তি, সবকিছুই যথাযথ উন্মোচিত করেন। তিনি দেখান যে মুক্তির একমাত্র পথ হল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ বদল করা।

এই প্রসঙ্গে লু শুন আরো বলেন, "নিজের কথা বলতে হলে বলি, নিজেকে প্রকাশ করবার জোরাল কোন তাগিদ আমি আর অনুভব করি না। তবু, হয়তো অতীত একাকীত্বের বেদনা সম্পূর্ণ ভুলিনি বলেই মাঝে মাঝে আমি আহ্বান পাঠাই,—সেই সব সংগ্রামীদের উদ্দীপনা দিতে যারা নিঃসঙ্গ ও একাকী ছুটে চলেছে,—যাতে তারা যেন আশা-ভরসা না হারায়, সেইজন্য। আমার এ আহ্বান সাহসিক না দুঃখবিষণ্ণ, ঘৃণা জাগানো না হাস্যকর, তা নিয়ে আমি পরোয়া করি না। যাই হোক,

যেহেতু এটি অস্ত্র ধরার আহ্বান, আমি আমার সেনাধ্যক্ষের হুকুম স্বাভাবিক ভাবেই মানব। তাই অনেক সময়ে আমি বক্রোক্তি ব্যবহার করি। যেমন "ওষুধ" গল্পে শূন্য থেকে ছেলেটির কবরে একটি শোকমাল্য এনে হাজির করেছি, "আগামীকাল" গল্পে বলিনি যে চতুর্থ শানের বউ তার ছোট্ট ছেলেটির স্বপ্ন দেখে নি। কেন না আমাদের অধ্যক্ষরা সে সময়ে নৈরাশ্যবাদের বিরোধী ছিলেন। অল্প বয়সে আমি যেমন দেখতাম, তেমনি করে যে সব তরুণেরা তখনো সুখপ্রদ স্বপ্ন দেখছে, তাদের আমি আমার সে নিঃসঙ্গতার ছোঁয়াচ দিতে চাইনি যে নিঃসঙ্গতা আমার কাছে অমন দুঃসহ লেগেছিল, এই শুধু—।"

লুশুন তাঁর "ওষুধ" গল্পে আঁকেন ১৯১১ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক বিপ্লবীর আত্মদানের চিত্র আর সে বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ। এ গল্পে শহীদ ছেলের কবরে চিং মিং উৎসবের অর্ঘ্য দিতে এসে মা যখন বলেন, "বাছা! ওরা সবাই তোর ওপর অবিচার করেছে, তা তুই ভুলতে পারছিস না। তোর দুঃখ কি এখনো এতখানি যে আজ এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটালি আমাকে তা জানতে দিবি বলে? …আমি জানি… ওরা খুন করেছে তোকে। কিন্তু বিচারের দিন আসবে, ঈশ্বর তা ঘটাবেন। শান্তিতে চোখ বোজ্।" তখন মা আর প্রকাশ্য ভাবে একটি শহীদের মা থাকেন না, প্রতীকায়িত হন সমগ্র দেশজননীতে, আর তাঁর কথার মধ্যে যেন দেশ ও সমাজ বাণীরূপ পায়।

মে-চার আন্দোলনের পর চীনের শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে এই তিন বছরে সারা দেশ জুড়ে ১০০টির বেশি ধর্মঘট হয়। এতে অংশ নেন ২,৫০,০০০ শ্রমিক।

১৯২০ সালের মে মাসে সাংহাই নগরে চেন তু-শিউ ও অন্যরা গড়ে তোলেন চীনের প্রথম কম্যুনিস্ট দল। সে বছরই আগস্ট মাসে সেই শহরেই প্রতিষ্ঠিত হল চীনা সমাজতন্ত্রী যুব লীগ। এর কিছু

পরেই পিকিং শহরে লি তা-চাও গঠন করেন কম্যুনিস্ট দল। তুং পি-উ-র নেতৃত্বে হুপে শহরে গঠিত হল অনুরূপ আরেকটি দল। এর পরে সিনান, ৎতিয়েনৎসিন, হ্যাংচৌ এবং ক্যাণ্টনে গড়ে উঠল একে একে কম্যুনিষ্ট দল।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে পঠনরত চীনা ছাত্ররা সেখানে এক চীনা সমাজতন্ত্রী যুবলীগ গড়ল। জাপান ও সোভিয়েট রাশিয়ার পঠনরত চীনা ছাত্ররা গড়ল কম্যুনিষ্ট দল।

হুনান শহরে মাও ৎসে-তুং আরেকটি চীনা সমাজতন্ত্রী যুব লীগ গড়লেন। শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচার করলেন। তাঁর কার্যক্রমের ফলে ওই প্রদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার এক শক্ত বনেদ তৈরি হল।

সাংহাই শহরে চীনের প্রথম কমুনিস্ট পার্টি স্থাপিত হবার পর লি শাও চি ও অন্যরা সে শহরে গড়লেন শ্রমিকদের নৈশ বিদ্যালয়, যন্ত্রপাতি তৈরির কারিগর ও মুদ্রণ কর্মীদের ফেডারেশন।

পিকিং নগরে কমুনিস্ট দল চাংশিনতিয়েনে গড়লেন শ্রমিকশিক্ষণ বিদ্যালয় এবং রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজকর্ম চালাতে থাকলেন। হ্যাংকাও-এর বিদেশী অধিকৃত অঞ্চলে ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রিকশা চালকদের সংগ্রামে হুপের কম্যুনিস্ট দল নেতৃত্ব দিল। অন্যান্য জায়গার কম্যুনিস্ট দলগুলিও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সমান তৎপর হয়ে উঠল।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রসার করার ও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামে পথ দেখাবার জন্য কম্যুনিস্ট দলগুলি বিভিন্ন জায়গা থেকে পত্র পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। এগুলি সাহায্য করল,

(১) চীনা শ্রমিকদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বুঝতে ;

(২) শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে, এবং

(৩) চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে।

কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের সহায়তায় উনিশশো একুশ সালের জুলাই মাসের এক তারিখে সাংহাই শহরে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হল। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন মাও ৎসে- তুং। তিনি হুনানের পার্টি সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন।

রুশ বলশেভিক পার্টির আদর্শে এই প্রথম জাতীয় কংগ্রেস, কাজের পথে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নেতৃত্ব সম্বলিত চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করল। গৃহীত হল পার্টির সংবিধান, নির্বাচিত হল পার্টির প্রধান সংগঠনগুলি। আর তার পর থেকেই চীনের বিপ্লবে এক মৌল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল।

১৯২১ সালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যুক্তফ্রন্টে প্রকাশ্যেই ভাঙন দেখা দেয় বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে। লু শুন এ সময়ে বার বার হতাশ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। তবু তিনি লড়াই করে গেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। অক্ষুণ্ণ থেকেছে তাঁর ভাবনা ও কর্মের অগ্রগতি। এর মধ্যেই তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও পিকিং নরম্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। ১৯২০ সালে তাঁর "আগামীকাল," "একটি ছোট ঘটনা," "আমার চুলের গল্প" এবং "চায়ের কাপে তুফান" গল্পগুলি প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় লু শুনের "আমার পুরনো বাসা" আর ডিসেম্বর মাস থেকে "পিকিং মরনিং পোস্ট" কাগজে বেরোতে থাকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প "আ কিউর সত্য কাহিনী"। ১৯২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে উনিশশো বাইশ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারী অবধি নয়টি সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। এ গল্পে লু শুন প্রধানত রূপায়িত করেছেন "জনগণের ভাষাহীন প্রাণকে, যা মস্ত পাথরের নিচে চাপা পড়া ঘাসের মত নীরবে জন্মায়। বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায়। আ-কিউবাদকে রূপায়িত করার সময়ে তিনি সবার

ওপরে আ কিউ ও তার মত লোকদের হয়ে প্রতিবেদন জানাচ্ছেন। আ কিউ-এর চরিত্র একটি আয়না। তাতে ফুটে উঠেছে চীনা জনগণের জীবনে চিরকালের অত্যাচার ও নিষ্পেষণ। লু শুন সে ভাবেই এঁকেছেন আ কিউকে। এর ওপরে তিনি দেখান, আ কিউ-এর জীবনের এ এক নির্মম ও করুণ পরিহাস, যখনি আ কিউ হেরে যায়, তখনি এ তার নৈতিক জয় বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার অভ্যাস রপ্ত করেছে। যেমন:

"বেকার নিষ্কর্মার দল যখন তাতেও থামত না, তাকে খুঁচিয়ে চলত। শেষ অবধি মারামারি লেগে যেত। তারপর আ কিউয়ের বাদামী বেণীটা টেনে, তার মাথাটা দেয়ালের গায়ে চার বা পাঁচবার ঠুকে দিয়ে তবে, জিতে যাবার খুশিতে নিষ্কর্মার দল চলে যেত তখনই। যখন আ কিউকে দেখে বোঝা যেত যে হেরে গেছে, আ কিউ একলহমা দাঁড়িয়ে থাকত। মনে মনে ভাবত, "এ যেন নিজের ছেলের হাতেই মার খেলাম। ছনিয়ার হাল আজকাল কি দাঁড়িয়েছে ?" ......তারপর সেও হাঁটতে শুরু করত। জিতেছে বলে বেজায় খুশি।"

এমনি করে আ কিউ নিজেকে ঠকাত, অন্যদেরও। এ তো পরাজয়বাদ। তারপর, কারা যে তার শত্রু, কারা যে তার ওপর অত্যাচার করে, আ কিউ প্রায়ই তা ভুলে যায়। শুধু তাই নয়, অত্যাচারী সেজে আ কিউ তার চেয়ে দুর্বল লোকের ওপর শোধ নেয়। এই মানসিকতা আমরা গোটা ছনিয়ায় সেই সব জায়গাতে প্রত্যহ দেখি, যে সব দেশে এসেছে মিথ্যে স্বাধীনতা, যে সব দেশে বিদেশী শাসন ছিল এবং তথাকথিত স্বাধীনতার পর যে সব দেশের সমাজ ও ভূমিব্যবস্থায় সামন্তবাদ জাঁকিয়ে বসে আছে। আ কিউ হল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদ শোষিত সকল মানুষের দর্পণ। আ কিউ-এর মানসিক গঠন ব্যাখ্যা করে লু শুন এখানে আমাদের পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দেন যে এ হল হাজার হাজার বছরের সামন্তবাদী শাসন এবং একশো বছরের বিদেশী আগ্রাসনেরই পরিণাম যদিও চীনের

জনগণ দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারের প্রতিরোধ করার জন্যে লড়েছে, তবু বারবার হেরে গেছে বলে তাদের মানসিকতায় জন্ম নিয়েছে পরাজয়বাদ, হার মানবার মনোবৃত্তি। এর সঙ্গে মিশেছে সামন্তবাদের শিক্ষা,—যে বলশালী ও শ্রেষ্ঠ তার কাছে নতি স্বীকার করা উচিত। আর এ থেকেই জমেছে আ কিউ-এর নৈতিক জয়লাভের নীতি বা আ কিউবাদ, যা আসলে নিজেকে নিজে ঠকাবার পলায়নী মনোভাব। অত্যাচারীর মোকাবিলায় রুখে দাঁড়াতে আ কিউকে বাধা দিচ্ছে এই আ কিউবাদ। আ কিউকে বুঝতে পারলে আমরা ছুনিয়ার ও স্বদেশের সকল আ কিউকে বুঝতে পারব।

অন্য যে সত্য এ গল্পে লু শুন আমাদের সামনে তুলে ধরেন, তা হল, আ কিউ এবং তার নিপীড়কদের মধ্যে যে নিয়মিত সংঘর্ষ চলে, তাতে আ কিউ "নতি স্বীকার করব না বিদ্রোহ করব", এ ছুয়ের দোটানায় ভোগে। বিদ্রোহী হবার তাগিদ তার মধ্যে থেকেই যায়।

সকল অত্যাচারিতের মত পায়ের বেড়ি ভেঙে ফেলে বিপ্লব করে তবেই তো আ কিউ নিজেকে মুক্তি দিতে পারে। সে শক্তি তার মধ্যে আছে। তাই, যখন ১৯১১ সালের বিপ্লব ঘটে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই আ কিউ-এর ভাগ্য তার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তাকে যে বিপ্লবে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়, তাতে তো এ কথাই প্রমাণ হয়ে যায় যে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। বিদ্রোহ করার একটা তাগিদ কিন্তু আ কিউর মধ্যে থেকেই যায়। বিপ্লবে যোগ দেবার একটা পথও খোলা থেকে যায় তার সামনে।

"কেমন করে 'আ কিউ-এর সত্য কাহিনী' লেখা হয়" নামীয় প্রবন্ধে লু শুন ১৯২৬ সালে যে ব্যাখ্যা দেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য।

"আমি যখন (পিকিং) শহরের পশ্চিম ফটকের কাছে থাকতাম, মনে হয়, শুধু "নতুন যৌবন" ও "নতুন জোয়ার" কাগজের কর্মীরা জানত যে আমিই লু শুন। এদের মধ্যে ছিলেন সুন ফুইউয়ান। তিনি সে সময়ে "প্রভাতী সংবাদ" (মর্নিং নিউজ) কাগজের ক্রোড়পত্র

সম্পাদনা করছেন। কার যে মাথায় এসেছিল বলতে পারি না, তবে ওরা হঠাৎ ঠিক করল যে হপ্তায় একটা করে ব্যঙ্গকৌতুকের কলাম রাখবে। তাই উনি (সুন) আমাকে লিখতে বলতে এলেন।

আমার কল্পনায় বহু বছর ধরেই আ কিউ থেকে গিয়েছিল তবু তার বিষয়ে লেখবার এতটুকু তাগিদ কখনো অনুভব করিনি। এই অনুরোধের ফলে তার কথা মনে পড়ল তাই আমি সেই সন্ধ্যাতেই প্রথম অধ্যায় "ভূমিকা" লিখে ফেললাম। "ব্যঙ্গকৌতুক" করে তোলার জন্যে সেখানে খানিক অদরকারী হাসিতামাশা ঢোকালাম। সেগুলো সত্যিই বলতে কি গোটা গল্পটার সঙ্গে খাপ খায় না। আমি খুব মার্জিত লোক নই তা দেখাবার জন্যে "বা রেন" (চীনা ধ্রুপদী শব্দনিচয়, মানে, অমার্জিত বর্বর) ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলাম।

প্রথম অধ্যায় বেরোতেই আমার দুশ্চিন্তা শুরু হল—প্রতি হপ্তায় একটা করে নতুন কিস্তি দরকার। তখনো ফুইউয়ান এতখানি মোটা হননি তবে তখনি তাঁর মুখে সদাই বিরাজ করত হাসি আর তখনি লোককে দিয়ে লিখিয়ে নেবার দক্ষতা তাঁর হয়েছিল। হপ্তায় একবার করে তিনি আমার বাড়ি আসতেন এবং প্রথম সুযোগেই বলতেন, আচ্ছা মশাই ——"আ কিউর সত্য কাহিনী" কাল - ছাপাখানায় পাঠাতেই হবে। ফলে আমাকে তখন লিখতেই হত।

দু মাস "আ কিউর সত্য কাহিনী" নিয়ে কাজ করার পর ওটা শেষ করতে ইচ্ছে হল সত্যিই। কি যে এর কারণ, ফুইউয়ান তা চাইছিলেন না, না আমিই ভেবেছিলাম যে লেখাটা শেষ করলে তিনি আপত্তি করবেন, তা আর পরিষ্কার মনে করতে পারি না। অতএব মহান সমাপ্তিটির (কি করে ঘটাব, সে) আইডিয়াটা নিজের মাথায়ই রেখেছিলাম, যদিও আ কিউ সমানে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছিল। শেষ অধ্যায়টি যখন দিলাম তখন যদি ফুইউয়ান থাকতেন উনি সেটি হয়তো চেপে যেতেন ও আমাকে বলতেন যে আ কিউকে যেন আরো কয়েক হপ্তা বাঁচিয়ে রাখি। তবে আমার কপাল ভালো ছিল। তিনি গেলেন

বাড়ি। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন, সেই শ্রীযুত হে জুয়েলিনের আ কিউ বিষয়ে (সে বাঁচুক বা মরুক) কোন অনুভূতিই ছিল না। অতএব আমি যখন 'মহান সমাপ্তি'টি পাঠালাম, তিনি সেটা ছেপে দিলেন। আ কিউ গুলি খেয়ে মরে যাবার পর এক মাসের বেশি না কাটলে কুইউয়ান যেহেতু পিকিংয়ে ফেরেননি ; সে হেতু মানুষকে দিয়ে লিখিয়ে নেবার ক্ষমতা এবং হাসি থাকা সত্বেও তিনি আর বলতে পারলেন না "মশাই······'আ কিউর সত্য কাহিনী' ·····এ ভাবেই আমি এ প্রসঙ্গ থেকে ছাড়া পাই ও অন্য কথা ভাবতে সময় পাই।

আ কিউর এই ব্যঙ্গকৌতুকরস সিঞ্চিত জীবনীতে লু শুন পাঠকদের নিয়ে যান তাঁর নিজের শহর শাও শিং-এর কাছে মফঃস্বলের এক গ্রাম ওয়েই কুয়াং-এ। আ কিউর উদ্ভব ও পশ্চাৎপট বিষয়ে অনিশ্চয়তা, তার এক উজ্জ্বল ও স্পষ্ট বর্ণনা দেন তিনি। যদিও আ কিউ দাবী জানাত যে "আমাদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল", তার "কোন পরিবার ছিল না। সে থাকত ওয়েই চুয়াং-এর গ্রাম দেবতার মন্দিরে। তার কোন বাঁধাধরা কাজও ছিল না। সে ছিল সিধা কথায় অন্যদের খুচরো কাজের কাজী। যখন গম কাটা দরকার, সে গম কাটত ; যখন ধান ভানা দরকার, সে ধান ভানত ; যখন নৌকোয় লগি ঠেলা দরকার, সে লগি ঠেলত।"

শ্রীযুত চাও-এর মত স্থানীয় জমিদারদের জন্যে সে খাটত। সে জুয়ো খেলত কিন্তু সর্বদাই নিজের সব টাকাপয়সা খোয়াত। গুঁপো ওয়াং আর ছোকরা ডি-র সঙ্গে তার লড়াই হত কিন্তু সে সব সময়েই হেরে যেত। তবু, মনস্তাত্ত্বিক বিজয়লাভ ঘটল মনে করে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিত। ভাবত, "এ যেন ছেলের হাতেই মার খেলাম। দুনিয়ার হালচাল আজকাল কি হয়েছে।···" চাও-পরিবারের একমাত্র পরিচারিকা আমা উ-কে সে প্রেম নিবেদন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু বেদম পিটুনি দিয়ে তাকে বের করে দেয়া হয়।

এক বার সে শহরে গিয়েছিল আর ওয়েইচুয়াং-এ বিক্রি করবে

বলে কিছু চোরাই মাল এনেছিল। তাতে গ্রামে খুব চাঞ্চল্য জাগে। ওয়েই চুয়াং-এ যখন ১৯১১-র বিপ্লবের খবর পৌঁছয়, আকিউ "বিপ্লবে" যোগ দেবার অসংলগ্ন চিন্তা করে। সে মনে ভাবে বিপ্লবের মানেটা সবশুদ্ধ এই রকম,—ধনীদের সম্পত্তি কেড়ে নাও বা লুট করো।

কিন্তু বিপ্লব তো ব্যর্থ হল। শ্রীযুত চাও এবং 'বাজে বিদেশী শয়তান'-এর মত সামন্ত জমিদার ও স্থানীয় ভদ্রলোকেরা নিজেদের সামাজিক উচ্চমানটি ধরে রাখল এবং তথাকথিত "মুক্তি দলে" যোগ দিল। এ ভাবেই তারা আ কিউকে বিপ্লব করতে দিল না। চাও বাড়ি চুরি হবার পরে আ কিউ মিছেমিছি অভিযুক্ত হল, মাঝ রাতে তাকে শহরে টেনে নিয়ে যাওয়া হল এবং শিখণ্ডী খাড়া করে তাকে গুলি করে মারা হল।

আ কিউকে গুলি করে মারা হয়। তবু সে বেঁচে আছে। আ কিউ-এর ভাবমূর্তি, আ কিউবাদ, বা আ কিউ-এর চরিত্র কখনো অন্তর্হিত হয়নি। তার কারণ, আ কিউ-এর মত যে সকল চাষীর পরিণাম ওর মতই হয়, তাদেরকে অন্যান্য দেশেও খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু চীন দেশে নয়।

লু শুন বলেছিলেন, তিনি চেয়েছেন "এক আধুনিক চীনার আত্মাকে উপস্থাপন করতে।" তিনি লিখেছেন, "তাই হপ্তার পর হপ্তা কাটতে থাকে। অবশ্যম্ভাবী হয় এ সমস্যা, আ কিউ বিপ্লবী হবে, না হবে না। আমার ধারণায়, চীনে যতদিন না বিপ্লব হচ্ছে, আ কিউ বিপ্লবী হবে না। একবার (বিপ্লব) হলে সে হবে (বিপ্লবী)। আমার আ কিউ-এর পক্ষে এই একমাত্র পরিণামই সম্ভব। এও আমি বলব না যে তার ছুটো সত্ত্বা আছে। প্রজাতন্ত্রের (১৯১১-র বিপ্লবের পরে) প্রথম বছর বিগত, সে আর ফিরবে না। তবে পরের বার (বিপ্লবে যদি) সংস্কার সাধিত হয়, আমার মনে হয় আ কিউর মত বিপ্লবী তখনো থাকবে। লোকে বলে আমি অতীতের এক সময়-কাল নিয়ে লিখেছি। আমারও মনে হয় তাই যদি হত। কিন্তু

আমার আশঙ্কা, যা দেখেছিলাম তা অতীত নয়। ভবিষ্যত আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর বাদে যা হবে।”

গল্পটি আমাদের সামনে ১৯১১ সালের বিপ্লবের একটা ছবি হাজির করে। চাষীদের সংগঠিত করা হয়নি বলে সে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। জমিমালিক শ্রেণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে তাকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে লু শুন, বুর্জোয়া শ্রেণীকে তিক্ত সমালোচনা করেন। কারণ, তারাই তো এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই গল্পে লু শুন মে-চার আন্দোলনের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৯১১-র বিপ্লবের ঐতিহাসিক শিক্ষার দিকে। মুক্তির পথের সংকেতও দেন আর সকল জনগণের দাবীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এই জনগণের বৃহদংশ হল কৃষকরা, আর্থনীতিক বিচারেও এরা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মে-চার আন্দোলনের সময়ে লু শুনের গল্পগুলি বিশেষ করে তরুণ পাঠক মনে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর কারণ কি, তা জানতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। সে জন্য লু শুনের গল্পের গভীর সত্যবাদিতা ও লেখার স্টাইলকে এক সময় “কারণ” বলে ধরা হত। আসলে ব্যাপারট হল এই, রাশিয়া ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের চর্চায় লু শুন অর্জন করেছিলেন এক উপলব্ধি। তাঁর বক্তব্যকে আধুনিক ছোট গল্পের রূপে বলতে হবে। নতুন চেতনা ও নতুন বক্তব্যের জন্য গল্প লেখার স্টাইলকেও হতে হবে আধুনিক।

ধ্রুপদী চীনা সাহিত্যে ছোট গল্প লেখার একটা ঐতিহ্য ছিল। তাং রাজবংশের ৭ম থেকে ৯ম দশক রাজত্বকালে চীনা গদ্য-রোমান্স লেখা হয়। ১১ থেকে ১৩ দশক, এই সময় কালে পেশাদারী গল্প কথকদের জন্য চীনা ভাষায় গল্পের বই ছিল। ১৫ থেকে ১৭ দশক সময় কালে মিং বংশের শাসন সময়ে এই গল্প কথকদের দেখে বলার বইগুলির কিছু কিছু বিদ্বানরা পরিমার্জন করলেন, ওগুলি নকল করে কিছু নতুন বইও লেখা হল। পু সংলিং (১৬৩০—১৭১৫) লিখেছিলেন “লিয়াওচাইয়ের আশ্চর্য গল্পমালা।” কিন্তু এগুলি তো

কোন অর্থেই আধুনিক ছোট গল্প নয়। এতে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আর চমকদারি ঘটনা সমাবেশের যত গুরুত্ব। সমাজ-পটভূমি, চরিত্র-চিত্রণ এগুলিতে অবহেলিত প্রায়। সেগুলি যেন অন্যভাবে লিখলে পরে উপন্যাসের মধ্যে ব্যবহার করা যেত।

লু শুন তা চাননি। তাঁর মতে উপন্যাস এক প্রাসাদ বিশেষ, যার মধ্যে বিধৃত থাকে যুগের মর্মবাণী। আর ছোট গল্প হল তেমন মূর্তি বা ছবি যা বিন্দুতে সিন্ধু দেখাতে সক্ষম। ছোট গল্প কখনোই উপন্যাসের ক্ষুদে অনুকরণ নয়। ছোট গল্পের মধ্যেকার বক্তব্য এক ঝলকে বোঝা যাবে। একটা দাগ এক ঝলক দেখলেই যেমন চেনা যায় হ্যাঁ, এটা চিতা বাঘ বটে।

লু শুন এবং বাইরের অনেক লেখক কোন একটি চরিত্রের জীবন নিয়ে ছোট গল্প লিখেছেন। লু শুনের "নববর্ষের বলি", "আ কিউর সত্য কাহিনী", চেকভের "জুয়াড়ি", "ডার্লিং" এ সব গল্প যেমন। চরিত্রগুলির জীবনের সামান্য অংশ নিয়ে এ সব গল্পে মূল চরিত্রে সমগ্রতা আনা হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে চীনা পাঠকের প্রথম পরিচয় করাবার সময়ে লু শুন ছোট গল্পকেই বেছে নেন। "অন্যদেশের গল্প" বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, "যখন গল্পগুলো প্রথম প্রকাশ হয়। তখন যে সব পাঠকের সঙ্গে দেখা হত তাঁরা এ সব গল্প যে দ্রুতগতিতে সমাপ্তিতে পৌঁছয় (তাতে খুশি না হয়ে) মাথা নাড়াতেন। সে সময়ে ছোট গল্প ছিল বিরল। তাঁদের তো অভ্যেস একশো / দু শো অধ্যায়ে লেখা উপন্যাস পড়া, তাই ছোট গল্প তাঁদের কাছে ছিল অকিঞ্চিৎকর।"

এ ভূমিকায় তিনি বলেন যে তাঁর চেষ্টা, পাঠক পড়ার ব্যাপারে চিরাচরিত প্রথা বর্জন করুন, অন্যেরা কি ভাবছে সে বিষয়ে মনোযোগী হন। লু শুনের অনুবাদ কর্ম এবং বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো চীনা পাঠকের, এর মধ্যে দিয়েই মে-চার আন্দোলন কালে লেখা আধুনিক চীনা ছোট গল্পের বনেদ রচিত হয়। তখন তিনি

ছোট গল্পই বেশি অনুবাদ করেন। পরে যখন প্রোলেতারীয় লেখকদের লেখা ছোট গল্প পাচ্ছিলেন না, যা পাচ্ছিলেন তা অনুবাদযোগ্য নয়। তখনি তিনি "দি নাইনটিন" "ডেড সোল্‌স", এ সব উপন্যাস অনুবাদ করেন। ছোটগল্প ব্যাপারটি তাঁর কাছে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ তবুও থেকে গেল। গর্কির "জানুআরি নাইন" কে তিনি "প্রগতিবাদী আদর্শ" বলেছেন। অনুবাদ করেছেন গর্কির "রুশ রূপকথা" ও অন্যান্য গল্প। উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এগুলির প্রশংসায়।

বিদেশী সাহিত্যের রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি এগুলি বেশ যাচিয়ে নিয়ে চীনা সাহিত্যে খাপ খায় এমন ভাবে বদল করে নিলে চীনা সাহিত্য রচনায় আধুনিকতা আনা যাবে বলে লু শুন মনে করতেন। এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "হয়তো বিদেশী লেখকদের কাছেই আমি সব চেয়ে বেশি শিখেছি। চীনের জীবনের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার জন্য তিনি অধীত শিক্ষা প্রয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গেই প্রাচীন চীনা সাহিত্য ধারা থেকে যা প্রয়োজন তাও নিয়েছেন। এ ভাবে এক নতুন ধারার লেখা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন তিনি, চীনের জাতীয় সাহিত্য ধারা নতুন সময়ের উপযোগী যেন হয়, সেজন্যই তাঁর এত চেষ্টা।

যা করতে চেয়েছেন, তা নিজের লেখাতেই করেছেন। ১৯২৩ সালে মাও তুন "অস্ত্র ধরো "বই পড়ে" নিবন্ধে লেখেন। "চীনের নয়া সাহিত্য মঞ্চে লু শুন সেই লোক, যিনি নতুন নতুন রীতি সৃষ্টি করছেন। 'অস্ত্র ধরো' বইয়ের দশ বা ততোধিক গল্পে প্রতিটি নিজস্ব নতুন রীতিতে লেখা। আমাদের তরুণ লেখকদের ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়বেই। অনেকেই তাঁকে ও তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে অনুসরণ করবেন।

আজ আমাদের কাছে "জনৈক উন্মাদের রোজনামচা", "কুং ই-চি", "ওষুধ", এ সব গল্প যে রীতিতে লেখা তা খুব চমকপ্রদ ঠেকবেনা। কিন্তু পড়লে পরে মনে হবে তা এই সময়ের জন্য লিখিত

কোন গল্প। সে অর্থে লু শুন তাঁর প্রচেষ্টায় সফল। গল্পগুলি এ সময়ের জন্যও বটে। উন্মাদের গল্পটি রোজনামচা লেখার পদ্ধতিতে রচিত। উন্মাদটি তার বক্তব্যে সরাসরি সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের সংগ্রামে আহ্বান জানায়। সময় ও দেশের সীমানা পেরিয়ে এ আহ্বান কি আমাদের দেশের পক্ষেও প্রযোজ্য নয়? কুং ই-চি এক সামন্তবাদী বুদ্ধিজীবী যে অধুনা বেজায় গরিব। সরাই খানার এক ছোকরা ওয়েটার কুং ই-চির কাহিনী বলতে গিয়ে সময়ের এক সমগ্র ছবি তুলে ধরে। "ওষুধ" এক ভয়ানক কাহিনী। সামন্ততন্ত্রী দেশ ঔপনিবেশিক শাসনে থাক'ল জাদুবিশ্বাস মানুষকে কি করে ফেলে, তার কাহিনী। সদ্য মাথা কাটা গেছে এমন এক বিপ্লবীর রক্তে ভিজানো তপ্ত বান-রুটি এক যক্ষ্মাগ্রস্ত শিশুকে দেয়া হয় খেতে। শিশুটিও পরে মারা যায়, কেন না নররক্তে তো কোন জাদুক্ষমতা ছিল না। এমন বিশ্বাসে আমাদের দেশেও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ আজও পৈশাচিক সব কাজ করেন মাঝে মাঝে। পরে বিপ্লবীর কবর থেকে একটি কাক ডেকে ডেকে দিগন্তে উড়ে যায় ও জানিয়ে যায় এখানেই সব শেষ হয় নি, বিপ্লবীর মৃত্যু বৃথা যায় নি। ধ্রুপদী চীনা সাহিত্য রীতিতে এমন সব জ্বলন্ত বক্তব্যবাহী কাহিনী লেখা যেতনা বলেই লু শুনকে চীনের মানুষের কথা চীনের মানুষকে জানাবার জন্য চীনের বাইরে তাকাতে হয়েছিল।

১৯২৬ সালে লু শুন আমেরিকান লেখক বার্টলেটকে বলেছিলেন, চেখভের লেখা তাঁর সব চেয়ে পছন্দ। রুশ লেখক ও রুশ সাহিত্যে ছোট গল্প প্রীতি তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র ও অনন্য চেখভের কাছে পৌঁছে দেয়। চেখভের লিখনরীতি তো বটেই, চেখভের উদ্দেশ্যও তাঁর কাছে দরকারী হয়ে ওঠে। গর্কি চেখভকে লিখেছিলেন, "ওই সব ছোট ছোট গল্পে আপনি মস্ত একখানা কাণ্ড করছেন। মানুষের চেতনা জাগাচ্ছেন আর তাদেরকে শেখাচ্ছেন এই অর্থহীন দুঃস্বপ্নময় অস্তিত্বকে ঘৃণা করতে, জাহান্নমে যাক সব কিছু!" লু শুনের উদ্দেশ্য ছিল, "রোগটা উন্মোচন করে দেখিয়ে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

করা, যাতে রোগ নিরাময় হয়।" দুজনের কাজে মিল আছে। চেখভের শৈল্পিকসিদ্ধিকে লু শুন অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে করতেন।

১৯৩৫ সালে লু শুন "মন্দ ছেলে ও অন্য রহস্যময় গল্প" বই থেকে আটটি গল্প অনুবাদ করেন। গল্পগুলি এত ছোট, তবু প্রতিটি চরিত্র কত জীবন্ত এবং পাঠক গল্পগুলি পড়তে বাধ্য হন। এ কথা লু শুন উল্লেখ করেন। চেখভের নৈরাশ্যবাদ বিষয়েও বলতে ছাড়েননি অবশ্য। চেখভের লেখনরীতি তাঁর কলাকুশলতা, লু শুনের কাছে ছিল বড়ই প্রিয়।

লু শুন ছিলেন বিপ্লবী। চেখভের চেয়ে অনেক রূঢ় ঋজুতায় তিনি প্রাচীন সমাজকে খণ্ডবিখণ্ড করে সমালোচনা করেছেন। কৃষক-সমাজকে লু শুন অনেক বেশি ভাল বুঝতেন। চেখভের গল্পে বাঁধুনি আঁটসাঁট, স্টাইল ঋজু, পাঠকদের তিনি নাড়া দেন ও সমাজসমস্যা বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেন। চরিত্র চিত্রণে চেখভ অপ্রয়োজনীয় কথায় যান না। জোর দেন কেন্দ্রীয় চরিত্রের ওপর। খুব সংক্ষেপে সে চরিত্রকে দাঁড় করাতে পারেন পাঠকের সামনে, বাছাই করা দ্যোতক ঘটনার সাহায্যে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রকৃতির দীর্ঘ বর্ণনা, সালঙ্কার ফেনিল ভাষা চেখভে অনুপস্থিত।

এ সবই লু শুনের কাজ ও উদ্দেশ্যের অনুরূপ। লু শুন, যখন খুব কম টানটোনে কোন লোকের প্রতিকৃতি আঁকতে হবে তখন চোখ দুটি আঁকায় বিশ্বাসী। যখন লু শুনের মনে হয়েছে যা বলতে চান তা পষ্টাপষ্টি বলা হয়েছে, তখন তিনি সানন্দে ঝালরঝোলর, আলগা অলঙ্করণ বাদ দিয়েছেন। লু শুন জানতেন তিনি কেন ছোট গল্প লিখছেন; কোন প্রয়োজনে আর এই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ছিল।

॥ পাঁচ

উত্তরের জঙ্গী সমর নায়কেরা যখন পরস্পরের মধ্যে হানাহানিতে ব্যস্ত, তখনই ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন সাংহাই থেকে ক্যান্টনে এলেন। কোয়াংটুং-এর জঙ্গী সমরনায়ক চেন মিউং মিং-এর শক্তির ওপর ভরসা করেই তিনি প্রজাতন্ত্রের জরুরি অবস্থাকালীন প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। এবং উত্তরাঞ্চল অভিযানের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু পরে চেন চিউং-মিংকে খরিদ করে নিল সাম্রাজ্যবাদীরা এবং জঙ্গী সমরনায়কেরা। সে এক সাজানো বিদ্রোহ খাড়া করল। ফলে ডাঃ সানকে কোয়াংটুং ছেড়ে চলে যেতে হল।

এ সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ান ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ডাঃ সানের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তাঁর দৃঢ়সংকল্প সংগ্রামের প্রশংসা করে এরা। কিন্তু জনগণের বৃহত্তর অংশের উপর আস্থা না রেখে তিনি যে ভুল করেছেন, তাও তারা দেখিয়ে দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়ান ডাঃ সানকে প্রস্তাব দেয়। তিনি যেন শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করে পার্টি গঠন করেন ও একটি সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ান ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সহায়তায় সান ইয়াৎ-সেন ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে সাংহাই শহরে কুওমিনটাংকে পুনর্সংগঠিত করার জন্যে এক সভা ডাকেন। এই সভায় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। ১৯২৩ সালে সান ইয়াৎ-সেন "কুওমিন্টাং ম্যানিফেস্টো" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অসম চুক্তিগুলিকে সংশোধন করার দাবী জানান। সোভিয়েট প্রতিনিধির সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে চীন-সোভিয়েট সম্পর্ককে সমস্তরে স্থাপন করেন।

কিছুদিন বাদেই ক্যান্টনে ফিরলেন ডাঃ সান। সেখানে তিনি বিপ্লবী সরকারের প্রধান সেনাপতির কেন্দ্র স্থাপন করলেন। সংগঠিত কুওমিণ্টাং সরকারের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি। তার মধ্যে রইলেন বহু কম্যুনিস্ট। তারপর তিনি তাঁর তিন মুখ্য নীতি কি হবে তা বললেন। তা হল :

(১) সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ;

(২) কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা ;

(৩) শ্রমিক ও কৃষকদের সাহায্য করা।

১৯২৩ সালের জুন মাসে ক্যান্টন শহরে তাদের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কম্যুনিস্ট পার্টি এক বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নটি আলোচনা করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সান ইয়াৎ-সেনের অবদানকে কংগ্রেস স্বীকৃতি দেয়। কুওমিণ্টাং পুনসংর্গঠনে ডাঃ সানকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। কম্যুনিস্ট পার্টি ও কুওমিণ্টাং-এর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের সিদ্ধান্তও নেয়।

১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ক্যান্টন শহরে কুওমিণ্টাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন করলেন। যে সব কম্যুনিস্ট এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাও ৎসে-তুং, লি তা-চাও, লিন পো-চু এবং চু চিউ-পাই। এই কংগ্রেস

(১) কম্যুমিস্ট পার্টির সমর্থিত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী নীতি মেনে নেয়।

(২) কম্যুনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক যুব লীগের সদস্যদের একক ব্যক্তি হিসেবে কুওমিণ্টাং-য়ে গ্রহণ করতে রাজী হয়।

(৩) কুওমিণ্টাংকে পুনসংর্গঠন করে শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এক বিপ্লবী মৈত্রীতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এমনি করে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি

(১) কুওমিণ্টাংয়ে আনে নতুন চেতনা।

(২) ডাঃ সানের বিপ্লব বিষয়ে সমঝোতা বাড়ায় ও বিপ্লবের উপর তাঁর আস্থাকে জোরদার করে।

(৩) এই ভাবে বিপ্লবের জন্য যে আন্দোলন, তাকে করে শক্তিশালী। এই কংগ্রেস "কুওমিণ্টাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টো" গ্রহণ করে। এই ম্যানিফেস্টোতে ডাঃ সান তাঁর তিন গণনীতির নতুন ব্যাখ্যা করলেন ও কয়েকটি প্রসঙ্গকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করলেন :

(১) সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ;

(২) কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি সহায়তা ;

(৩) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী জঙ্গী সমরনায়কবাদ বিরোধিতা ;

(৪) জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক সমতাকে সমর্থন ;

(৫) জমিমালিকানায় সমতা ;

(৬) পুঁজি নিয়ন্ত্রণ।

পুরনো এবং নতুন "তিন গণনীতি"র তুলনা করে ম্যানিফেস্টোটি দেখিয়ে দিল দুটির মাঝখানে যে সময় কেটেছে তাতে ডাঃ সানের চিন্তাভাবনা কতখানি অগ্রসর হয়েছে।

কুওমিণ্টাং পুনসংগঠনের পরে, ক্যাণ্টনের কাছে হোয়ামপোআ সামরিক একাডেমি স্থাপন করার কাজে ডাঃ সানকে সাহায্য করল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি। একাডেমিতে মুখ্য পদগুলিতে থাকলেন চৌ এন-লাই, ইয়েহ্ চিয়েন-ইং ও অন্য কম্যুনিস্টরা। সোভিয়েট পরামর্শদাতার একাডেমিতে প্রবর্তন করলেন লাল ফৌজের নিয়মশৃঙ্খলা ও তত্ত্ব। এখানে ক্যাডেট ছিলেন বহু কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী যুব লীগের সদস্যরা। পরিণাম হল এই, হোয়ামপোআ সামরিক একাডেমিটি দ্রুত বিপ্লবী সশস্ত্র ফৌজের সুতিকাগার হয়ে দাঁড়াল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির যুক্তফ্রণ্টনীতি বিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দিল এবং

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনগুলিকে সামনে এগিয়ে দিল। ৭ই ফেব্রুয়ারির রাজনীতিক ধর্মঘটের ফলে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি পুনর্গঠিত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকরা উঠে দাঁড়াল এবং বিপ্লবের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

চীনে বিপ্লবী আন্দোলনের তড়িৎ গতি উন্নতি, সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলিকে ভীষন ঘাবড়ে দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুম মতো ১৯২৪ সালের অক্টোবরে ক্যান্টন বণিক স্বেচ্ছাসেবী ফৌজ, ক্যান্টনের বিপ্লবী সরকার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এক সাজানো সশস্ত্র দাঙ্গা বাধাল। এই স্বেচ্ছোসেবী ফৌজ আসলে চেন লিম-পাকের নেতৃত্বাধীন এক মুৎসদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী ও জমিমালিক শ্রেণীর সশস্ত্র সংগঠন। বিপ্লবী সরকার তখন হোয়ামপোআ সামরিক একাডেমির ক্যাডেটদের এবং বিপ্লবী সশস্ত্র ফৌজের একাংশের জোটক সামিল করে। সে জোটের পেছনে শ্রমিক-কৃষকের সমর্থন নিয়ে সে আক্রমণকে সে নস্যাৎ করে দিল।

পিকিং সরকারের ওপর চিহ্‌লি জঙ্গী সমরনায়ক চক্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ জারি হবার পর ইঙ্গ-মর্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব গেল বেড়ে। এতে উদ্বিগ্ন হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তারা ফেংতিয়েন ও আমহোয়েই-এর জঙ্গী সমরনায়কদের উশকানি দিল চিহ্‌লি-চক্রের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধাবার। চিহ্‌লি-চক্র এতে হেরে যায় এবং আনহোয়েই চক্রের তুয়ান চি-জুই ফের আনে স্বনিয়ন্ত্রণাধীনে। সেখানে সে এক "শাসক মন্ত্রীসভা" খাড়া করে।

সে সময়ে জনগণ দাবী করছিল:

(১) এক জাতীয় এসেমব্লির সমাবর্তন;

(২) সংবিধান সংরচন;

(৩) গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

কম্যুনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে, এক জাতীয় এসেমব্লি

তাড়াতাড়ি গঠিত হোক — দাবী জানাতে সাংহাই, টোকিয়ো ও কোয়াংটুং-য়ে কমিটি গঠিত হল।

জনগণের তরফ থেকে চাপ আসতে থাকায় জঙ্গী সমরনায়ক সরকার ডাঃ সানকে পিকিংয়ে ডাকল অলোচনার জন্য। কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থন পেয়ে ডাঃ সান রওনা হলেন পিকিং। উদ্দেশ্য সত্বর জাতীয় এসেমব্লি অধিবেশনের পথ তৈরি করা এবং বিপ্লবী চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করা। "উত্তর যাত্রা বিষয়ক ম্যানিফেস্টো"-তে তিনি, তাঁর সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী অবস্থানকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁর সংগ্রামে জনগণের সমর্থনকে আমন্ত্রণ জানালেন।

ডাঃ সান পিকিং পেঁাছলেন। জঙ্গী সমরনায়ক চেষ্টা করল তাঁকে দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী নীতি পরিত্যাগ করাতে। তারা বলল, ডাঃ সান যেন জঙ্গী সমরনায়কবাদের সঙ্গে আপস করে নেন। ডাঃ সান অবিচল রইলেন তাঁর বিপ্লবী নীতিতে। জঙ্গী সমরনায়কদের ভিত্তিহীন আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ পিকিংয়ে ডাঃ সানের মৃত্যু হল। এই মহান বিপ্লবী গণতন্ত্রীর মৃত্যুতে জাতীয় শোকের ব্যাপারটি এক ব্যাপক রাজনীতিক প্রচার অভিযানে পরিণত হল।

মৃত্যুশয্যায় ডাঃ সান সোভিয়েট সরকারকে তাঁর শেষ চিঠি লেখেন। এ চিঠিতে সোভিয়েট বন্ধুদের প্রতি চীনা জনগণের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। সে চিঠির কোন কোন অংশ এ রকম :

"আপনারা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র সমূহের সমষ্টির নেতৃত্বে আছেন— নিপীড়িত জনগণের জন্য মৃত্যুহীন লেনিনের রেখে যাওয়া প্রকৃত উত্তরাধিকার সেটিই। সেই উত্তরাধিকারের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদের যারা শিকার, তারা তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারবে, মুক্তি অর্জন করতে পারবে সেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার হাত থেকে, যে ব্যবস্থার ভিত্তি দীর্ঘকাল ধরে প্রোথিত আছে দাসপ্রথা, যুদ্ধ ও অবিচারের ভেতরে……

প্রিয় কমরেডগণ, আপনাদের কাছে বিদায় নেবার সময়ে আমি জানাতে চাই আমার প্রজ্জ্বলন্ত আশা যে শীঘ্রই সেদিন আসবে, যেদিন সৎ বন্ধু ও মিত্র হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া স্বাগত জানাবে এক ক্ষমতাশালী স্বাধীন চীনকে, দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিগুলির স্বাধীনতার সংগ্রামে এই দুই মিত্র দেশ হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাবে বিজয়ের দিকে।"

ডাঃ সানের এই অন্তিম বাক্যগুলি যেন প্রতীক হয়ে ওঠে। ইতিহাসে চীনা ও সোভিয়েট জাতিগুলির মধ্যে যে সংগ্রামী বন্ধুত্ব দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, যে বন্ধুত্ব বছরে বছরে বেড়েছে, যা কোনদিন ভাঙবে না, সেই মহান মৈত্রীর প্রতীক ওই কথাগুলি।

সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ঐ সব লুটতরাজ বাড়িয়ে দেয়, চীনের জনগণ ও সম্পদকে শোষণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে চীনে তাদের স্থাপিত কলকারখানার সংখ্যা বেড়ে যায়। জাপানী-মালিকানার কাপড়কলগুলির বিষয়ে এ কথা বেশি করে সত্যি। ১৯২৫ সালের মধ্যে চীনা মালিকানার কাপড় কলের যে সংখ্যা, তার দুই তৃতীয়াংশে পৌঁছে যায় জাপানী পুঁজিতে চলা কাপড় কলের সংখ্যা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানে পারত সেখানে ঢুকিয়ে দিত শিশু শ্রমিক আর ছাঁটাই করত বেশি মজুরির সাবালক শ্রমিকদের, চীনা শ্রমিকরা কাজ করত শারীরিক নির্যাতন, বেত খাবার আতঙ্ক আর আর্থিক বিপর্যয় ও ছাঁটাই হবার আতঙ্ক মাথায় নিয়ে। আর্থনীতিক শক্তিতে বলীয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত এবং জাতীয় শিল্পপতিরা এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভীষণ রকম অক্ষম ছিল।

১৯২৫ সালের ১৪ই মে শাংহাইয়ে একটি জাপানী মালিকানার কাপড় কলের শ্রমিকরা চীনা শ্রমিক বরখাস্তের প্রতিবাদে হরতাল করে। হরতালের দ্বিতীয় দিনে মালিকদের দালাল বাহিনী শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায় এবং জনা বারো শ্রমিক হতাহত হয়। এতে শ্রমিকদের মধ্যে জাগে বিক্ষোভ। ছাত্র ও জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিবাদ শুরু করে।

কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মিলিত হয় আর শ্রমিকদের মূল শক্তি হিসেবে রেখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে উত্তুঙ্গে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩০শে মে, শাংহায়ের ছাত্ররা পড়াশোনা ছেড়ে পথে পথে ইস্তাহার বিলি করতে বেরিয়ে পড়ে। চীনা জনগণকে কসাইয়ের মতো হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদীরা যে অপরাধ করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ইস্তাহারগুলি লেখা হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তখন বড় বড় পুলিশ বাহিনী পাঠায়। এরা নানকিং রোডে বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ফলে জনগণের ক্রোধানলে ঘি পড়ল। হাজার হাজার লোক "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!" "চীনের সকল জনগণ ঐক্যবদ্ধ হও!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে নানকিং রোডে ভিড় করল। বৃটিশ পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালাল। নানাকিং রোড রক্তে ভিজে গেল। এই ঘটনা "ঘটনা ৩০শে মে-র গণহত্যা" নামে ছড়িয়ে পড়ল।

এই গণহত্যার পর কম্যুনিস্ট পার্টি শাংহাই শহরের সকল শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও ছাত্রকে হরতাল চালাবার আহ্বান জানাল।

১লা জুন এই ঝটিকাউত্তাল সংগ্রামের সূচনা। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শাংহাইয়ের মানুষ শ্রমিক-ব্যবসায়ী ও ছাত্রদের এক যৌথ কাউন্‌সিল গঠন করল। শ্রমিকরা নামাল কাজ করার যন্ত্রপাতি, ছাত্রেরা ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করল, ব্যবসায়ীরা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করল।

বৃটেন, আমেরিকা ও জাপান হোয়াংপু নদীতে তাদের যুদ্ধজাহাজ পাঠাল এবং এ বিক্ষোভ প্রদর্শনকে নিরস্ত করার জন্যে ফৌজ নামিয়ে দিল। কিন্তু জনগণের দৃঢ়সংকল্প ইচ্ছাশক্তিকে এ সব কিছু তিলমাত্রাও দমাতে পারল না। জনগণের মধ্যে সংগ্রাম ছড়াতে থাকল এবং "সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করো" শ্লোগান সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকল।

সেনাসামন্ত দেখিয়ে ভাঁওতা মেরে জনগণকে দিয়ে নতিস্বীকার করানো যাবে না তা বুঝে এখন সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য পথ ধরল। তারা শাংহাইয়ের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহায্য নিল। কখনো হুমকী দিয়ে কখনো বা প্রলোভন দেখিয়ে তারা চেষ্টা করল যাতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এই যুক্ত ফ্রন্টটি ভেঙে দেয়। জঙ্গী সমরনায়কদের সঙ্গে তারা ষড়যন্ত্র চালান যাতে বিভিন্নস্থানে আন্দোলন দমন করা হতে থাকে।

শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সংরক্ষণ করার জন্যে কম্যুনিস্ট পার্টি, "শ্রমিকদের আর্থনীতিক দাবী মিটাতে হবে" এই শর্তে হরতাল তুলে নিতে সিদ্ধান্ত করল। আগস্ট মাসে সকল শিল্পেই শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে শুরু করল।

৩০শে মে—আন্দোলনের পরে পরেই এক উত্তাল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ আরেকবার বয়ে গেল দেশের মাটি জুড়ে।

এই বিশেষ সময় কালের সব চেয়ে প্রচণ্ড প্রকাশ ঘটে ক্যান্টন-হংকং হরতালের মধ্যে।

১৯২৫ সালের ১৯শে জুন হংকং শহরের এক লক্ষেরও বেশি শ্রমিককে নিয়ে শাংহাইয়ের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে এক হরতাল সংগঠন করে কম্যুনিস্ট পার্টি। পরিস্থিতির মহড়া নিতে হংকংয়ের বৃটিশ-কর্মকর্তারা সামরিক আইন জারি করে ও এই বৃটিশ-উপনিবেশের অবরোধের আদেশ দেয়। চীনা শ্রমিকরা তাতে এতটুকু দমে না এবং আরো বেশি শ্রমিক চলে যায় ক্যান্টনে।

২৩শে জুন ক্যান্টনে, হংকংয়ের ধর্মঘটী শ্রমিক সহ এক লক্ষ লোক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য ও ছাত্ররা ছিল। শাকী-তে বৃটিশ ও ফরাসী যুদ্ধজাহাজ এদের ওপর বোমাবর্ষণ করে। ফলে পঞ্চাশজন নিহত হয় এবং ঘটনাটি "শাকী গণহত্যা" নামে আখ্যাত হয়।

ক্যান্টন ও হংকং-এর মানুষের মধ্যে শাকী-র ঘটনা প্রচণ্ড বিক্ষোভ

জায়গায়। সু চাও-চেং ও তেং চুং-শিয়া। দুই কম্যুনিষ্টের নেতৃত্বে দুই লক্ষ শ্রমিকের এক হরতাল হয় হংকং-য়ে। ধর্মঘটীরা ক্যান্টনে আসতেই থাকে। ফলে হংকং পর্যবসিত হয় এক মৃত বন্দরে।

জুলাইয়ের গোড়ার দিকে ধর্মঘটীরা সংগঠন করে সশস্ত্র সান্ত্রী পিকেট বাহিনী। এই বাহিনী সোয়াটাও এবং পাখোই-এর মধ্যবর্তী উপকূলরেখা অবরোধ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দারুণ আঘাত হানে।

ক্যান্টন-হংকং ধর্মঘট ১৬মাস না কাটলে শেষ হয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘতমকাল-ব্যাপী এ ধর্মঘট, ক্যান্টনে অবস্থিত বিপ্লবী সরকারকে প্রভূত শক্তিশালী করেছিল।

ক্যান্টনে বিপ্লবী সরকার স্থাপিত হবার পর জঙ্গী সমরনায়ক চেন চিউং-মিং, ওয়াইচো চাচো সোয়াটৌ, কোয়াংটুং-এর এই তিন জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করে ক্যান্টন আক্রমণ করার মতলব আঁটে। বিপ্লবী শাসনকে দৃঢ় সংবদ্ধ করার জন্যে ক্যান্টন সরকার, কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনে ১।২।১৯২৫ তারিখে তার প্রথম পূর্বাঞ্চল অভিযান শুরু করে।

হোয়ামপোতা সামরিক একাডেমির ক্যাডেটরা ছিল পূর্বাঞ্চল অভিযানকারী ফৌজের প্রধান শক্তি। সংখ্যায় অল্প হলেও এই ক্যাডেটরা সাহসী ও দক্ষ সেনা, লড়েছিল তারা উল্লেখযোগ্য দক্ষতায়। পূর্ব কোয়াংটুংয়ে চেন চিউং-মিং-এর বাহিনীর অধিকাংশকে এরা মাত্র দু'মাসের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

জুলাই মাসের গোড়ার দিকে, কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ক্যান্টন-বিপ্লবী-সরকার, জাতীয় সরকার রূপে পুনসংগঠিত হয়। তারপর এই সরকার জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ গঠনে এগোয়, যে ফৌজের মেরুদণ্ড হোয়ামপোআ সামরিক একডেমির ক্যাডেটরা।

সোভিয়েট সামরিক ব্যবস্থার আদলে চীনের জাতীয় বিপ্লবী ফৌজে থাকল কুওমিণ্টাং এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিরা।

কুওমিনটাং-এর বিপ্লবী প্রবণতাকে শক্তপোক্ত করার জন্যে যে সব কম্যুনিস্ট কুওমিনটাং-যে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের নির্বাচিত করা হল এই ফৌজে কুওমিণ্টাং প্রতিনিধি হিসেবে, নয়তো বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনীতিক দপ্তরগুলির পরিচালক হিসেবে। এ সব কারণেই জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ হতে পারল এক নতুন ধরণের প্রাণবন্ত দুর্মদ বিপ্লবী ফৌজ।

কিছুকাল না যেতেই চেন চিউং-মিং, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মদত পেয়ে প্রতিবিপ্লবী ফৌজের ঝড়তিপড়তি যা ছিল তা সংঘবদ্ধ করল এবং আরেকটি আক্রমণের পরিকল্পনা করল।

জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ দ্বিতীয়বার পূর্বাঞ্চল-অভিযান চালিয়ে শত্রু এলাকার ভেতরে ঢুকে গেল এবং চেন চিউং মিংয়ের পরাজয় এবার চূড়ান্ত হল।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শ্রেণীও এগিয়ে চলল। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে এ দুয়ের আন্দোলন এক বিশাল শক্তি হয়ে উঠল।

১৯২৫ সালে কোয়াংটুং-য়ে কৃষক আন্দোলন খুব জোরদার হল। এ সময় কৃষক সংগঠনগুলি গ্রামে প্রভাব বাড়াল। ১৯২৬ সালের মধ্যে এ সব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষে। কৃষকরা গড়ে আত্মরক্ষা বাহিনী এবং এ সব বাহিনী ক্যাণ্টন-হংকং ধর্মঘটকে প্রভূত বল যোগায়।

কোয়াংটুং-য়ে হাইফেং ও লুফেং-এ কম্যুনিস্ট পেংপাই পরিচালিত কৃষক আন্দোলনটি সব চেয়ে শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত ছিল। দ্বিতীয় পূর্বাঞ্চল অভিযান কালে চেন চিউং-মিং-এর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে ভেঙে চুরমার করে দেবার কাজে যখন বিপ্লবী জাতীয় ফৌজ ব্যস্ত, এ আন্দোলন সে সময়েই ঘটে। সে সময়ে হাইফেং ও লুফেং-এর আশপাশের সমস্ত কৃষক সক্রিয় আন্দোলনে সাড়া দেয়। কৃষক সংগঠনগুলির নেতৃত্বে তারা খাজনা কমানোর জন্য, লেভি বিরোধিতায়

এবং জমিমালিকদের সশস্ত্র অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

কোয়াংটুং-এর এই প্রচণ্ড কৃষক আন্দোলন. বিপ্লবী সরকারের পিছনে এক নির্ভরযোগ্য শক্তি ছিল। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটির এক শক্তি খুঁটি এ আন্দোলন।

কম্যুনিস্ট কুওমিণ্টাং সহযোগিতা স্থাপন হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিশাগুলি ঘাবড়ে যায়। কুওমিণ্টাং-এর ভেতরে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের দিয়েই বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টকে হীনবল করে ফেলার ষড়যন্ত্র আঁটে সাম্রাজ্যবাদীরা।

এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মাথায় ছিলেন চিয়াং কাই-শোক। ১৯১১-র বিপ্লবের সময়ে চিয়াং কাই-শেক শাংহাই শহরে স্টকও শেয়ার দালাল। শেয়ার দালালী কারবারে চিয়াং সাফল্য পাননি তিনি ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে যোগ দেন এবং সবরকম কপট চাতুরি করে ডাঃ সানের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। পরে তিনি হোয়ামপোআ সামরিক একাডেমির প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসেন উঁচুতে উঠতে। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলি এবং বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী চিয়াংকে "আমাদের লোক" বলে চিনতে পারে এবং চিয়াং তাদের রূপে বিপ্লবী শিবিরে থেকে যায়।

১৮।৩।১৯২৬ তারিখে চিয়াং কাই-শেক, হোয়ামপোআ সামরিক একাডেমির ক্যাণ্টন অফিসের নামে লি চিহ্-লুংকে এক হুকুমনামা পাঠান। চিহ্ এক কম্যুনিস্ট। সে সময়ে চিহ্ নৌ-দপ্তরের অস্থায়ী পরিচালক। চিয়াং তাঁকে হুকুম দেন। হোয়ামপোআতে "চুং শান" যুদ্ধ জাহাজটি পাঠাতে, সেটিকে অন্য কোথাও পাঠানো হবে। জাহাজটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলে পরে চিয়াং কাই-শেক দলে দলে কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তার করতে থাকেন। এই কম্যুনিস্টরা ছিলেন হোয়ামপোআ সামরিক একাডেমি ও জাতীয় বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে যুক্ত। চিয়াং মিথ্যা অভিযোগ আনেন যে এরা "চুং শান" যুদ্ধ জাহাজের সাহায্য

নিয়ে এক দাঙ্গা বাধাবার মতলব আঁটছিল। এটি "চুং শান যুদ্ধ-জাহাজের ঘটনা" নামে পরিচিত।

কুওমিণ্টাং-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক অধিবেশনের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেক "পার্টির ব্যাপারে উন্নতি সাধন বিষয়ক সিদ্ধান্ত" প্রচার করেন "চুং শান" ঘটনার পরে পরেই। কুওমিণ্টাং-এ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অবস্থানকে সংকোচন ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়। এতে বলা হয়ঃ

(১) যে সব কম্যুনিস্টরা একই সঙ্গে কুওমিণ্টাং-এরও সদস্য, তাদের নামের তালিকা কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যানকে দিতে হবে।

(২) উচ্চতর কুওমিণ্টাং সংগঠনসমূহে কম্যুনিস্টরা এক-তৃতীয়াংশের বেশি কার্যকরী-সদস্য থাকতে পাবে না।

(৩) কুওমিণ্টাং-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে কোন কম্যুনিস্টকে পরিচালক রাখা চলবে না।

(৪) কোন কুওমিণ্টাং সদস্য, কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে পারবে না।

সে সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টি খুবই শক্তিশালী। সে জন্যেই খোলাখুলি ভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে সাহস পেলেন না চিয়াং কাই-শেক। তাঁর বেইমানসুলভ প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ আরো ভাল করে চালাবার জন্য বিপ্লবী শিবিরেই থাকা স্থির করলেন তিনি।

এই সময়কালে, ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে লু শুন অনেক গদ্য কবিতা লেখেন। ১৯২৭ সালে এগুলি নিয়ে "বুনো ঘাস" কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ইংরিজি সংস্করণের ভূমিকায় লু শুন কবিতাগুলি প্রসঙ্গে বলেছেন, "অধিকাংশ লেখাই এক বিশেষ মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। কেন না সে সময়ে সোজাসুজি কিছু লেখার বা বলার উপায় ছিল না। তাই আমাকে দ্ব্যর্থক ভাষা ব্যবহার করতে হয়।"

ভাষা ছিল দ্ব্যর্থক, তা তিনিই জানান। কিন্তু মূল ভাবনায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না। ভাবনায় ও গীতিময় প্রকাশে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রকাশের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বহুলাংশে তিনি বৈদেশিক কাব্য-চর্চায় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। ১৯১৯ সালের নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে বিদেশী গদ্য কবিতা নানা অনুবাদের মাধ্যমে চীনের পাঠকদের কাছে খুব পরিচিত হয়ে ওঠে।

লু শুন যখন জাপানে ছাত্র, তখনই ওলন্দাজ কবি ভ্যান ইডেনের কবিতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এই কবিতাবলীর চীনা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন, "ছন্দহীন কবিতা, বড়দের জন্য রূপকথা।" তিনি আরো বলেন যে, "অন্যের পছন্দমত খাবার খেতে আমি মোটেই আগ্রহ বোধ করি না। আমি যে খাবার খেতে পছন্দ করি, তা অবশ্য অজ্ঞাতে অন্যকে খেতে অনুরোধ করি। এর উদাহরণ হল দে ক্লাইন জোবেন্‌স।"

এই ভ্যান ইডেন যে কেবল লু শুনের মত ডাক্তারী ও জীববিদ্যা পড়েছিলেন তাই নয়, অনেক বিষয়েই তাঁর অগাধ পড়াশোনা ছিল। কিন্তু লু শুন আগ্রহী হয়েছিলেন ইডেনের কবিতার আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে। এঁর বিষয়বস্তু বহিরঙ্গে আপাত কাল্পনিক, আসলে তা বাস্তববাদী। তাতে গাছপালা, পাখি, পোকামাকড় ভাবতে পারে, কথাও বলতে পারে।

লু শুন তাঁর "বুনো ঘাস"-এর প্রস্তাবনায় লিখেছিলেন, "বুনো ঘাসের শিকড় গভীরে প্রোথিত নয়। এর সুন্দর ফুল নেই, পাতা নেই। তবু সে শিশির পান করে, পান করে জল আর পান করে মৃতের রক্ত মাংস, যদিও সকলে এর প্রাণহরণ করতে উদ্যত। যতদিন সে বেঁচে থাকে, মরে, শুকিয়ে, ধ্বংস হয়ে না যাওয়া অবধি সকলেই একে মাড়িয়ে চলে।" ভ্যান ইডেনের মত লু শুনও বেছে নেন এক প্রতীকী আঙ্গিক, আর বিষয়বস্তুতে সৃষ্টি করেন এক অনন্য জগত, যা সবল ভাবেই চীনের সমকালীন শোষণ ব্যবস্থাকে

চিহ্নিত করে এবং একসঙ্গেই জনগণকে বিদ্রোহের আহ্বান জানায়।

"বুনো ঘাস"-এর গদ্য কবিতাগুলি লু শুন লেখেন এক বিশৃংখল সময়ে। তখন দিনের পর দিন তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে, পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। কখনো নিজেকে বড়ই একা বোধ করেছেন। কখনো নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তবু নিরন্তর প্রয়াসে খুঁজে চলেছেন বিপ্লবের পথ। সর্বদা হাত বাড়িয়ে রেখেছেন সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের দিকে তাই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের প্রয়াসে গদ্য-কবিতার মধ্যেই নিজের চিন্তাভাবনার স্ববিরোধিতাকে প্রকাশ করেছেন। তার জন্য দিকপাল সহযাত্রীদের চিন্তাভাবনা ও রচনাপদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন সচেতন আত্মানুসন্ধিৎসায়।

এই জন্যই গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর টুর্গেনিভের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। লু শুন নিজের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য যে স্বপ্নকল্পনার আশ্রয় নেন। তা অনেকাংশেই টুর্গেনিভের সমধর্মী। "মৃত আগুন" থেকে তাঁর কবিতাবলীর ধারা এগোয় "আমি স্বপ্ন দেখে-ছিলাম" এই ভাবনায়, যেন সমস্ত প্রয়াসই এক স্বপ্ন। আর "ছায়ারা বিদায় নেয়", "সুন্দর গল্প", এবং জাগরণ" তো আসলে এই স্বপ্নই। নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব, যা তখনো লু শুন ঘোচাতে পারেননি, সেই আবেগ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে ফোটাতে তিনি স্বপ্ন ও কল্পনার আশ্রয় নেন। এই পদ্ধতি টুর্গেনিভও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর "পৃথিবীর শেষ দিন", "পোকামাকড়", "প্রকৃতি", "স্বর্গ ও খ্রীষ্ট" স্বপ্ন হিসেবেই লেখা। "বুড়ী মহিলা", "দুই ভাই" ইত্যাদিকে কাল্পনিক আখ্যা দেওয়া চলে। যদিও টুর্গেনিভ লু শুনের ভাবনাকে জাগিয়ে ছিলেন। তবু আঙ্গিকের সাদৃশ্য বাদ দিলে তাঁদের তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা।

লু শুন নিজের কবিতাবলী বিষয়ে যা বলেছেন। তা এখানে উল্লেখ করা দরকার। তিনি লিখেছেন: "হারানো প্রেম সম্বন্ধে

তৎকালে যে ধরণের কবিতা লেখা হত, তাকে ব্যঙ্গ করেই লেখা হয় "আমার হারানো প্রেম" কবিতাটি। সমাজের কিছু নিষ্ক্রিয় দর্শকের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে লেখা হয় "প্রতিহিংসা।" যুবকদের নিষ্ক্রিয়তায় বিস্মিত হয়ে "আশা" কবিতাটি লেখা হয়। জঙ্গী সমরনায়কদের অসৎ কাজে প্ররোচিত করত যে সমস্ত পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোকেরা, তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ "এমনই এক যোদ্ধা।" যে সব বন্ধুরা আমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাদের জন্য লিখেছিলাম "নষ্ট পাতা।"

"নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর তুয়ান চি-হুই সরকার গুলি চালনা করার পরই আমি লিখি "ম্লান রক্তের দাগ।" তখন আমাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। যুদ্ধবাজ ফেংতিয়েন ও চিহ্‌লি চক্রের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে লিখি "জাগরণ।" এরপর আর আমার পক্ষে পিকিং-এ থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলা চলে যে এগুলোর বেশির ভাগই অবহেলিত নরক রাজ্যের সীমান্তে ফোটা ছোট ছোট ধূসর ফুল, যে গুলো স্বাভাবিক কারণেই সুন্দর হয়ে উঠতে পারেনি। এই নরকরাজ্য শেষ হয়ে যেতে বাধ্য। কয়েকজন বান্দা ও দুর্ধর্ষ "বীর"-এর অভিব্যক্তি ও দৃঢ়তার মধ্যে দিয়েই আমি এটা অনুভব করেছিলাম। আর এর ওপর ভিত্তি করেই আমি লিখি "যে সুন্দর নরক শেষ হল।"

এই গদ্যকবিতাগুলি লেখার সময়েও লু শুন মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠেন নি। ফলে দেশ ও সংগ্রাম বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বহু সংশয় ও দ্বন্দ্ব ছিল। তবে দেশাত্মবোধক লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগ থাকার ফলে তিনি মূল সমস্যা ও সত্যকে চিহ্নিত করতে ভুল করেন নি। চীনের তৎকালীন শত্রু যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, এ সত্যকে তিনি তাঁর প্রথম গল্প থেকেই প্রকাশ করেছেন। তাকে উৎখাত না করলে যে দেশেব মঙ্গল আসবে না, এ কথা তিনি বলেন কখনো রূপকে, কখনো ব্যঙ্গে। যেমন "বুনো ঘাস"-এর প্রস্তাবনায়

তিনি লেখেন: "আমি বুনো ঘাস ভালবাসি; কিন্তু যে মাটি বুনো ঘাসে নিজেকে ঢাকে, তাকে আমি ঘৃণা করি।

মাটির নিচে একটা গোপন আগুন ছড়াচ্ছে, ফুঁসছে। যদি একবার পৃথিবীর স্তর ভেদ করে বেরিয়ে আসে গলিত লাভা, তবে তা বুনো ঘাস ও উঁচু গাছ, সব কিছুকেই গ্রাস করবে। কিছুই আর থাকবে না ধ্বংস হবার।

আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন নই, আমি আনন্দিত। আমি চিৎকার করে হেসে উঠব আর গান গাইব।"

বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদকে যদি আমরা বুনো ঘাস হিসেবে চিহ্নিত করি, তাহলে বোধ হয় এ গ্রন্থের প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা করতে অসুবিধে হয় না। সেই সঙ্গে লু শুন দেখেন যে তরুণেরা জেগে উঠছে আর মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট:

"হ্যাঁ, আমার সামনে তরুণদের শক্তি জেগে উঠছে। ওরা ক্ষিপ্ত অথবা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠছে। কিন্তু এই নিঃশব্দ, রক্তঝরা তেজকে আমি ভালবাসি। কারণ ওরাই তো আমাকে জানিয়েছে যে আমি মানুষের পৃথিবীতে বাস করি—আমি মানুষের মধ্যে বাস করি।" (জাগরণ)

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে ১৯২৫ সালে পিকিং-এর মহিলা নরম্যাল কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলন চালিয়ে কলেজের প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেন্টকে তাড়ায়। লু শুন তখন এই বিপ্লবী ছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ান ও দৃঢ়ভাবে তাদের সমর্থন করেন। এ সময়ে তিনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উত্তরের জঙ্গী সমরনায়ক সরকার ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে তিনি কখনো আপসের পথ নেননি। তাঁর মত ছিল, "জলে পড়া কুকুরকেও মারা যেতে পারে। যেতে পারে কেন বলব, মারাই উচিত।"

১৯২৬ সালের মার্চ মাসে উত্তরাঞ্চলের জঙ্গী সমরনায়ক তুয়ান চি-স্থই যখন পিকিং-এর ছাত্র ও জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়,

তার প্রতিবাদে লু শুন ধিক্কার জানান সমর নায়কদের আর সরাসরি শ্রদ্ধা জানান যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে :

"মানব জাতির মধ্যে থেকে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের আবির্ভাব ঘটছে। যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বর্তমান ও বিগত দিনের সমস্ত ধ্বংসস্তূপ ও নির্জন সমাধিগুলোর মধ্যে দিয়ে সে দেখতে পায় সমস্তই। সে স্মরণ করে তীব্র ও অফুরন্ত দুঃখ আর বেদনা। সে চেয়ে থাকে জমাট বাঁধা রক্তের দিকে। যারা মারা গেছে, যারা বেঁচে আছে, এমন কি যারা জন্মাবে, প্রত্যেকের অস্তিত্বকেই সে অনুভব করে। স্রষ্টার খেলার মধ্যে সে সমস্ত কিছুকেই দেখতে পায়। আর সে জেগে উঠবে মানবজাতিকে বাঁচাতে কিংবা ধ্বংস করে ফেলতে। এরা স্রষ্টার বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজা।

দুর্বল স্রষ্টা কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখে। আর যোদ্ধার চোখে তখন পৃথিবী ও স্বর্গের রং বদলায়।" (ম্লান রক্তের দাগ)

ছয় ॥

লু শুনের জীবনব্যাপী যুদ্ধে প্রবন্ধগুলি ছিল তীক্ষ্ণতম তরবারি। লক্ষ্যণীয় যে প্রবন্ধে তিনি বিদেশের প্রভাব মুক্তপ্রায়। চীনের সমাজ বাস্তবতা ও ধ্রুপদী চীনা সাহিত্য তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত। লু শুন প্রবন্ধের গুরুত্ব দিতেন খুব। একবার শু কুয়াংপিং-কে লিখেছিলেন, প্রবন্ধ হচ্ছে "সাংস্কৃতিক" ও "সামাজিক সমালোচনা।" যে সব সমসাময়িক বিদেশী লেখকের প্রবন্ধ সমাজ-সমস্যা ও সংস্কৃতি-তত্ত্বকে উন্মোচন বা সমালোচনা করত, সেগুলি তিনি দেখতেন। ১৯২৫ সালে সে জন্যেই তিনি জাপানী প্রবন্ধকার কুরিয়াকাওয়া হাকুসনের "গজদন্ত

মিনার ত্যাগ" অনুবাদ করেন ও উপসংহারে লেখেন, "এটি দেশের সকল ভাবপ্রবণতা, মধ্যপন্থাবাদ, আপস, কপটতা, সংকীর্ণতা, অহংবাদ ও রক্ষণশীলতার ওপর তীব্র ও বিবেকী আক্রমণ। আমরা, বিদেশী পাঠকরা পর্যন্ত তাঁর (আক্রমণের) তীক্ষ্ণধার অনুভব করি। তা শণের পাঁজার মধ্যে ধারাল ছুরির মত কেটে বসে যায়।" চীনের "গোপন ব্যাধিগুলি" নিরাময়ের জন্যে এ "বিদেশী ওষুধের দোকান থেকে কেনা একটি ভাল বিশোধক।" "তাঁর দেশের দুর্বলতাগুলির ওপর লেখকের আক্রমণ বজ্রপাতের মত······আমার মতে, যে সব দোষত্রুটিকে তিনি আক্রমণ করেছেন, সেগুলি আমাদেরও দুর্বলতা। নিজেদের প্রেক্ষিতে সেগুলি নিয়ে চিন্তা করলে আমরা ভাল করব।"

১৯২৮ সালে তিনি জাপানী লেখক ৎসুরুমি ইউস্কে-র "চিন্তা-ভাবনা, নিসর্গদৃশ্য, মানুষ" অনুবাদ করেন। এটি "প্রবন্ধ সংকলন"। লেখকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে লু শুন একেবারেই ভিন্ন মত কিন্তু তাঁর মনে হয় বইটিতে কিছু "দরকারী ও উপকারী ব্যাপার আছে।" সমাজকে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে বইটি আদর্শ বিশেষ। কেন না চীনের অবস্থার সঙ্গে বইটিতে উল্লেখিত জাপানের কোন কোন অবস্থার নিদারুণ মিল আছে। তা ছাড়া এগুলির লেখার রীতি অন্তর্ভেদী, যাকে বলে লক্ষ্য ভেদী, "বোতল থেকে জলের মতো স্বতোৎসারিত, পাঠকের আগ্রহ শেষ অবধি ধরে রাখে।"

লু শুনের মতে মে-চার আন্দোলনের পর নতুন লেখা লেখির মধ্যে "ছোট ছোট গদ্য রচনা সম্ভবত ছোট গল্প, নাটক ও কবিতার চেয়ে অধিকতর সফল হয়েছে।" তিনি বলেন, "যেহেতু প্রায়শই এগুলির আদর্শ থেকেছে ইংরিজি প্রবন্ধ, সেহেতু এগুলিতে আছে খানিক ব্যঙ্গ কৌতুক, কোমলতা। এগুলি সযত্নে রচিত ও মার্জিত। পুরনো সাহিত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবার কাছে এ (প্রবন্ধ) গুলি যোদ্ধার ভূমিকায় কাজ করে।"

লু শুনের প্রবন্ধাবলীর লেখনশৈলী ইংরিজি প্রবন্ধের চেয়ে জাতে

আলাদা। সেগুলি সংক্ষিপ্ত, মনকে ভাবায় ও আবেগে উদ্বেল করে। ইংরিজি প্রবন্ধ তাঁকে কখনো প্রভাবিত করে নি। তবে লেখকের মনে বিপ্লবী সংগ্রামের দায়িত্ব চেতনা ক্ষুণ্ণ না হলে কোন লেখক ইংরিজি প্রবন্ধ সাহিত্যকে আদর্শ মনে করলে লু শুনের আপত্তি ছিল না।

১৯২৮ সালে যখন তিনি "খর স্রোত" (দি টরেন্ট) পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সে সময়ে "পৃথিবীর বিলোপ" প্রবন্ধ অনুবাদ করার সময়ে লেখেন, "প্রবন্ধটি অনুবাদ করা সহজ নয়। আমি শুধু একটা রীতি প্রবর্তন করতে চাইছি। ভবিষ্যতে অনুরূপ আরো (প্রবন্ধ) পেলে আমি সেগুলি ছাপাব।" এতে প্রবন্ধকাররা প্রবন্ধরীতির সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যাপারে তাঁর সমর্থন ছিল তাই বোঝা যায়।

লু শুনের প্রবন্ধ লেখার প্রথম পর্যায় কাল ১৯১৮ থেকে ১৯২৭। আমরা যেন মনে রাখি যে মে-চার আন্দোলন হয় ১৯১৯ সালে এবং প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ হয় ১৯২৪-১৯২৭ অবধি। এই দেশ ও জাতির ভাগ্য জড়িত ঘটনাগুলি এ সময়ের প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট।

অবশ্য ১৯২৭ সালে প্রকাশিত "সমাধি" প্রবন্ধ সংকলনে ১৯০৭ সাল থেকে লেখা চারটি প্রবন্ধ ও ছিল। বাকি উনিশটি ১৯১৮-১৯২৫ সালের মধ্যে লেখা। ১৯১৮-১৯২৪ সালের মধ্যে লেখা একচল্লিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয় "গরম হাওয়া" বইয়ে (১৯২৫)। "মন্দ ভাগ্য" (১৯২৬) সংকলনে ছিল ১৯২৫ সালে লেখা একত্রিশটি প্রবন্ধ। "মন্দ ভাগ্য ২নং" (১৯২৭) সংকলনে ১৯২৬ সালের বত্রিশটি এবং ১৯২৭ সালের একটি প্রবন্ধ ছিল। "এবং এই হল কথা" (১৯২৮) সংকলনে ১৯২৭ সালের উনত্রিশটি ও ১৯২৬ সালের একটি প্রবন্ধ ছিল। "তিনটি অবসর" (১৯৩২) বইয়ে ছিল ১৯২৭ সালে লেখা "ঘণ্টাঘর" ও "নীরব চীন।" ১৯২৭ সালের ১০ই এপ্রিলে লেখা "শাংহাই ও নানকিং পুনরুদ্ধারে উৎসব করার অন্যদিক" প্রবন্ধটি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এটির হদিস মিলেছে।

এ কথা সত্যি যে মে-চার আন্দোলন যেমন চীনের তরুণদের প্রবল বিদ্রোহী মনোভাবের উজ্জ্বল স্বাক্ষর, অন্যদিকে প্রদীপের নিচে গাঢ় অন্ধকার তখনো ছিল। তখনকার সামন্তবাদের প্রতি অনুগত সাহিত্যিকরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও উত্তরের সমরনায়কদের সমর্থন জানাতে আসরে নেমে পড়েছিলেন। গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি দেশের মঙ্গল করছিল আর এঁরা বলছিলেন যে দেশটা জাহান্নমে গেছে।

এঁদের মতে সন্তানরা পিতাদের আদেশ মুখ বুজে মানবে। বিধবারা আত্মহত্যা করবে। সামন্তী নৈতিকতা ও পিতৃতন্ত্রী কর্তৃত্ব এঁদের কাছে ছিল খুবই ভাল জিনিস।

এঁরা কনফুসিয়াসকে পূজা করা, কনফুসীয় ধ্রুপদী সাহিত্য পড়া, "জাতীয় চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য" অক্ষুণ্ণ রাখা—এ সবকে উচ্চ ঠাঁই দিতেন। কুসংস্কারকে জীইয়ে রাখতেন, বিজ্ঞানকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখতেন। সব রকম গণতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তাকে মনে করতেন বিপজ্জনক। সর্বরকমে এঁরা চীন দেশকে অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীলতা যাদের জীবন ও চিন্তাকে চালনা করছে তারা তো পরস্পরে গাঁট বেঁধেই চলবে। এই সব সাহিত্যিকরা উত্তরের সমরনায়কদের অকুণ্ঠ সমর্থক ছিল। আর জঙ্গী সমরনায়কেরা এ সব স্তাবক ও ক্রীতদাস সাহিত্যিকদের সমর্থনে অস্বাভাবিক রকম প্রতিক্রিয়াশীল কাজ করত। জঙ্গীদের সরকার ডিক্রি জারি করেছিল, অমানবিক নিষ্ঠুরতার মানদণ্ডে যে সব মেয়ে "সতী" বলে প্রমাণিত হবে, তারা সরকার দ্বারা সম্মাণিত হবে। বিদ্যালয়গুলিতে কনফুসিয়াসের উদ্দেশে বলিদান ও কনফুসীয় সাহিত্য পড়ার হুকুমজারি জঙ্গীদের সরকারই করে। অর্থাৎ জঙ্গীদের সরকার ও তাদের দালাল সাহিত্যিকরা সবরকমে অন্ধকার কুসংস্কার ও বিজ্ঞানবিরোধিতার রাজত্ব চীনের মানুষের মনে কায়েম করতে চাইছিল।

সে জন্যই লু শুন আঘাত হেনে চললেন অন্ধকারের দুর্গগুলিতে

একের পর এক, বললেন। জাহান্নমে পাঠাও সামন্তবাদী প্রথা ও নীতিবোধ, সামন্তবাদী পরিবার প্রথা, কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল, জঙ্গী সমর নায়ক ও বুরোক্রাটদের। ওরাই এ সব ধ্যানধারণা ও ব্যবহার প্রবক্তা।

পাঠকদের বললেন, মুক্ত কর মেয়েদের ও তরুণদের। অর্জন কর, ছিনিয়ে নাও তোমাদের সন্তানদের জন্য উজ্জ্বল ও আরো ভাল এক ভবিষ্যত।

আর কপটাচারীদের মুখোশ তিনি ভীষণ ক্রোধে ছিঁড়ে ফেলতে থাকলেন।

চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ ছিল সে সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে মুক্ত করা। ১৯১১ সালের বিপ্লব সে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে নি। মে-চার আন্দোলন সে কাজই করছিল।

কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন জোর কদমে এগোচ্ছে, চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন দু ভাগ হয়ে যায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ফেরত ছাত্রদের অধিকাংশকে নিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া অংশটি গঠিত। এদের প্রধান হল হুশি, এইসব ছাত্রেরা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে চলে যায়। এরা প্রথমে উত্তরের জঙ্গী সমরনায়কদের, পরে কুওমিণ্টাংকে সমর্থন করে। তাই লু শুনকে এই সব আধুনিক "ভদ্রলোক"দের বিরুদ্ধেও লড়তে হল।

অনেক ধূর্ত এরা আগেকার কট্টর বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে। বুদ্ধিজীবীর মুখোশ পরে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের তদ্‌গত সেবক সেজে এরা বলতে থাকল, বুদ্ধিজীবীরা সোশ্যালিজ্‌ম জাতীয় "ইজ্‌ম" চর্চা বাদ দিয়ে সত্যিকারের সমস্যা নিয়ে চর্চা করুক। তারা আস্তে আস্তে সংস্কার সাধনের কাজ করুক, চীনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিষয়ে জানুক, গবেষণাগারে থাক। অর্থাৎ বিপ্লব থেকে মনোযোগ সরিয়ে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা জনগণ থেকে দূরে চলে যাক। নিজেরা নিজেদের নিয়ে একটা ওপরতলার শ্রেষ্ঠ বাসিন্দাদের মহল তৈরি করুক।

এদের উদারতাবাদ ও সংস্কারবাদ যে মুখোশ মাত্র, তা জানানো দরকার ছিল। পশ্চিমের শিক্ষাব্যবস্থার কারখানায় তৈরি এ সব ছাত্র দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। ১৯২৫ সালে লু শুন লড়াই শুরু করলেন প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা "আধুনিক সমালোচক" ও চেন ইউয়ানের বিরুদ্ধে। এ লড়াই বিপ্লবী বনাম প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীর লড়াই। লু শুন যে সব নাম ও ঘটনার কথা বলেছেন তা আজকের পাঠকের কাছে খুব জানা নয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যসমালোচক কু কিউবাই (১৯০০—১৯৩৫) বলেছেন:

"হয়তো আজ কিছু তরুণ এ প্রবন্ধগুলিতে তেমন আগ্রহ বোধ করেন না কেন না তাঁরা চেন ইউয়ানের কত মানুষদের ইতিহাস জানেন না। লু শুনের প্রবন্ধগুলিতে চেন ইউয়ান, জ্যাংশিজাও আর অন্যান্য নামগুলিকে বিশেষ চরিত্র ও চারিত্রিক বাচক বলে ধরা যায়, এটা ঘটনা। তাদের জীবন বিষয়ে সব কিছু জানার কোন দরকার নেই। চীনে আজও কিলবিল করছে এসব ঘৃণ্য প্রাণীতে যেমন, "তোষামুদে বেড়াল, প্রভুর চেয়েও নাকতোলা কুকুর, কামড় বসাবার আগে বহুক্ষণ খ্যাঁচখ্যাঁচ করে এমন মশা, ভণিতা হিসেবে বহুক্ষণ ভ্যানভ্যান ও ভ্যানতাড়াই করে একটু ঘাম চেটে খেয়ে পুরীষ ত্যাগ করে চলে যায় এমন মাছি।" এসব লজ্জাহীন বেল্লীক, এসব ক্রীতদাস ও সময়ের বান্দাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা সংগ্রাম কালে একান্ত আবশ্যিক।"

অর্থাৎ সে সময়ে লু শুন ও অন্যান্য বিপ্লবী লেখকদের কাজ ছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকা ফেরত কপট-উদারনীতিকদের, কট্টরপন্থীদের ও সংস্কারবাদীদের সঙ্গে লড়াই চালানো। তবে লু শুন তার চেয়েও বেশি কাজ করলেন। তিনি আক্রমণ করলেন বহু পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা ও আচার-প্রথাকে। চীনা জীবনধারার সমগ্রে তাঁর মনোযোগ দিলেন, বিপ্লবের সকল সমস্যাকে ধরতে চাইলেন।

এই পর্যায়ের প্রবন্ধে তিনি নারীদের সতীত্ব বিষয়ে বলেছেন "যদি মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা থাকত, আর মানুষ এ-ওকে সাহায্য করত,

তবে এক বিধবা নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চীনে এর উল্টোটাই হয়। তাই মহিলার টাকা থাকলে তাঁর ভাবনা থাকে না আর গরিব হলে তিনি উপোস করে মরবেন। আর উপোসে না মরা অবধি তিনি সম্মানিত হবেন না, তাঁর নামও স্থানীয় ইতিহাসে উঠবে না।······সেই জন্যেই বলি "সতী" হওয়া বড় দুঃখের।" আরেকটি প্রবন্ধে (আমাদের পিতা হিসাবে আজ কি প্রয়োজন) কট্টরপন্থী পিতৃশাসিত মূল্যবোধকে আক্রমণ করে বলছেন। "দুনিয়াতে অবশ্য এমন সব বৃদ্ধেরা আছেন, যাঁরা শুধু যে নিজের সন্তানদের মুক্ত করবেন না তাই নয়, স্বীয় সন্তানদের নিষেধ করবেন তাদের সন্তানদের মুক্ত করতে। এঁরা এঁদের বংশধরদের বাধ্য করছেন অনর্থক নিজেদের নষ্ট করতে।" এ সময়ে লু শুনের এলোমেলো ভাবনা থেকে কয়েকটি এরকম :

১। "যুদ্ধকালে সামরিক ডাক্তারের চাকরি হল শ্রেষ্ঠ চাকরি। বিপ্লবে সব চেয়ে পিছনে থাকা সবচেয়ে ভালো। খুনের সময়ে খুনী হওয়া সব চেয়ে ভালো। এ সকল কাজ বীরোচিত আর নিরাপদ, দুইই।

২। অধিকাংশ লোকই জানেন যে সৈন্যদের হুকুম তাড়িত করার কাজেই সমরনায়কের তরবারি ব্যবহার হয়। তাঁরা বোঝেন না যে সেটি বুদ্ধিজীবীদের আদেশ চালিত করার কাজেও ব্যবহার হয়।

৩। যখনি কোন ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়পরা লোক হেঁটে যায়, কোন পোষা কুকুরটা ডাকে, যদিও হয়তো আসলে ওটার প্রভু ওটাকে অনুরূপ কোন হুকুম দেয়নি। প্রায়ই কুকুরটি মনিবের চেয়ে জবরদস্ত।

৪। হয়তো কোন দিন জীর্ণ পোশাক পরা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। যদি পারো, তোমাকে সবাই কম্যুনিস্ট বলবে।

৫। কোনো রমণীর জামার খাটো হাতা দেখলে তৎক্ষণাৎ তাদের মনে হতে থাকে উন্মুক্ত হাত, নগ্ন দেহ, যৌনাঙ্গ, রমণ, লাম্পট্য ও জারজ সন্তানদের কথা।

এই হল একমাত্র বিষয় যাতে চীনাদের কল্পনাশক্তি বেশ জীবন্ত।”

এ কোন নৈরাশ্যবাদী বা নষ্ট বিশ্বাস মানুষের কথা নয়! এমন সব কথা তিনিই লিখতে পারেন, যিনি প্রচণ্ডতার কশাঘাতে দেশের মানুষের মনকে বিদ্ধ করে জাগাতে চান।

পরের পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয় যথাক্রমে “তিনটি অবসর”, “দুটি হৃদয়”, “মিশ্রিত সংলাপ”, “মিছা স্বাধীনতা” ও “আধা লঘু কথাবার্তা” বইয়ে। এ পর্যায়ের প্রবন্ধরচনা কাল মোটামুটি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩।

এ সময়কালের ইতিহাস কি? ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ হল চীনে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ সে যুদ্ধের প্রথম ভাগ। চীন তখন বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল। কুওমিণ্টাং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে। চীনে চলছে সন্ত্রাসের কাল। কুওমিণ্টাং সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, প্রগতিবাদীদের জেলে পুরছে ও হত্যা করছে, জনগণের বিপ্লবকে ফৌজ নামিয়ে দমন করছে। সাংস্কৃতিক জগতে ফেলেছে কালো ছায়া। ১৯৩১ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তরপূর্ব চীনে বিশাল ভূখণ্ড দখল করল। ১৯৩২ সালে আক্রমণ করল শাংহাই।

চীনের জনগণ চাইছে গৃহযুদ্ধের অবসান, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছে আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে। কুওমিণ্টাং তা শুনবে কেন? মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর সামন্তবাদী জমিমালিকদের তল্পীবাহক কুওমিণ্টাং চীনের প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে জুটিয়ে নেমেছে কম্যুনিস্ট দমনে। জাপানের সকল দাবী সে মেনে নিয়েছে। যতই কুওমিণ্টাং জনপ্রিয়তা হারাল ততই সে পাশবিক হল দমনে-নিপীড়নে। ভাষণ দানের ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা গেল। বইয়ের দোকান ধ্বংস হল, দেশপ্রেমী ও প্রগতি-বাদীরা হয় বন্দী নয় নিহত হতে থাকল। লু শুনের নাম তখন কালো খাতায়, চিহ্নিতদের তালিকায়। স্বনামে লেখা ছিল অসম্ভব, তাই ছদ্মনামেই অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি।

এ সময়ে, সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাবার সঙ্গে সঙ্গে কুওমিন্টাং তার পশ্চিম প্রত্যাগত ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের লেলিয়ে দিল। এরা একই সঙ্গে প্রগতিশীল লেখকদের ওপর আক্রমণ চালাল। অনেকে গুজব ছড়াল, অনেকে হল গুপ্তচর। বন্ধুর মুখোশ মুখে এঁটে এরা সাহিত্যের শ্রেণী চারিত্র্যকে গৌণ করে শুদ্ধ শিল্প সাহিত্য যে কত ভাল তাই বলতে থাকল। এ ভাবে তরুণ প্রজন্মকে নষ্ট করার, মূল সমস্যা থেকে মনোযোগ সরাবার কাজ চালাল তারা।

লু শুনের এ সময়ের প্রবন্ধাবলীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই। লু শুন তাই জনগণের অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। কুওমিন্টাংয়ের স্বরূপ খুলে দিয়ে বললেন. "আক্রমণ কারীদের তাড়িয়ে দেবার আগে ঘরের ঝামেলা মেটাতে হবে।" কপটাচারীদের বললেন, এরা একদল "ঘর হারা পাহারাদার কুকুর পুঁজিপতিদের।" তারপর বললেন, "শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাসকারী কোন লেখক শ্রেণীকে অতিক্রম করতে পারে না। যুদ্ধকালে কেউ রণাঙ্গন ত্যাগ করে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আজ যে বেঁচে আছে সে কখনো আগামী কালের জন্য লিখতে পারে না। এ শুধু তুচ্ছকল্পনা মাত্র। তেমন কোন মানুষ বাস্তব জীবনে নেই।"

তিনি "জাতীয়তাবাদী সাহিত্য" শিবিরের লেখকদের বিষয়ে বলেন যে তারা চেঁচায় ও হইচই করে "আমরা যে রাজ্যসীমানা হারিয়েছি সে ক্ষতি পূর্ণ করতে, শবযাত্রায় ভাড়াটে শোককারী ও বাজনদারের মতই" কিন্তু আসলে তো চীনের রাজ্যসীমা জাপান গ্রাস করলে পরে এদের এসে যায় না কিছুই, কেননা এরা হল সাম্রাজ্যবাদীদের হীনতম বান্দা।

এ সময়েই প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক বাধে। বিপ্লবী সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কে লু শুন মহোৎসাহে অংশ নেন। এই সব তর্কবিতর্ক ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের তত্ত্ব প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায় ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত বিপ্লবী নীতিগুলি রূপ নিতে

থাকে। লু শুন যখন "বামপন্থী লেখক লীগ প্রসঙ্গে আমার চিন্তাভাবনা" লিখছেন, তখন প্রগতিশীল লেখকদের যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে।

লু শুন এ সময়ে চিন্তাভাবনা ও অর্জিত বিশ্বাসে পৌঁছে গেছেন গন্তব্যে। আর তাঁকে পথ খুঁজতে হবে না, আর এখন তাঁর চিন্তাভাবনা যেমন ঋজু, তেমন নিরাভরণ ও প্রত্যক্ষ। "দুটি হৃদয়" বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলছেন. "আমি শুরু করেছিলাম আমার স্বশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা দিয়ে। আমি তাকে চিনতাম এবং তার ধ্বংসে আমার কোন কষ্ট ছিল না। পরে ঘটনাবলী আমাকে শিখাল যে উদীয়মান প্রলেতারিয়েতদের হাতেই একমাত্র আছে ভবিষ্যতের দখল।"

এ পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে লেখা আর লু শুনের মৃত্যুই তো হয় ক্ষয় রোগে ১৯৩৬ সালে। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে লু শুনের ক্রমপরিণতি আর তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে প্রবন্ধগুলিতেই তাঁর বিবর্তন ও পরিণতির প্রবাহ পথের মানচিত্র আছে। লু শুন প্রতিক্রিয়াশীল বা ভাববাদী বা শুদ্ধ শিল্পতাত্ত্বিক শিবির থেকে "প্রলেতারীয়েতের কড়াপড়া হাতে ভবিষ্যৎ বিধৃত" এ বিশ্বাসে আসেন নি। সূচনাতে, রমণীদের সতীত্ব বিষয়ক প্রবন্ধতেই জানা গিয়েছিল এ নদীস্রোত কালে বিশালত্বে বিলীন হয়ে বেঁচে থাকবে। তাঁর জীবনকালে দেশব্যাপী যুদ্ধ, বিপ্লব, কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্ভব ও সংগ্রামী ভূমিকা নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তিনিও তো ছিলেন সেই লেখক যিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মাটি থেকে শিক্ষাগ্রহণে আর সেজন্যই তাঁর ভূমিকা এমন করে চীন দেশের প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। লু শুন সর্ব যুগে সর্ব সময়ে আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশের নষ্ট বিশ্বাস বামপন্থী লেখকদের বিবেকে এক প্রবল কশাঘাত, এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আসলে তিনি নিজেকে কখনো বাঁচিয়ে চলেন নি এবং মাটি থেকে লব্ধ এ শিক্ষা কখনো ভোলেননি যে সংগ্রাম কখনো ফুরায় না। কি হাতেকলমে

কর্মী কম্যুনিস্টের, কি সৎ কম্যুনিস্ট লেখকের। প্রগতি ও সংগ্রামী চেতনার দুর্গকে সদাজাগ্রত শাস্ত্রীর মত নিরন্তর রক্ষা না করলে ছিদ্রপথে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটে। লু শুন লিখিত এই পর্যায়ের প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু উধৃতি তাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

(১) আজকে তথাকথিত বিপ্লবী লেখকরা নিজেদেরকে লড়াকু অথবা সীমা অতিক্রান্তকারী বলে থাকেন। সত্যি বলতে কি বর্তমান সময়কে অতিক্রান্ত করার ব্যাপারটা এক ধরণের পলায়নী মনোবৃত্তি। এ'রা যদি নিজেদেরকে বিপ্লবীই বলেন ও তৎসত্বেও বাস্তবের মুখোমুখি হবার সাহস না থাকে তবে (পলাতকের) পথই তাঁরা নিতে বাধ্য, সচেতনে বা (না জেনে) অন্য ভাবে।

"যদি তুমি এই পৃথিবীর বাসিন্দাই হও, এর থেকে দূরে যাবে কেমন করে? নিজের কান টানলে মাটি ছেড়ে উড়ে যেতে পারো, এমন দাবীর মত সেটাও হবে জোচ্চোরি। সমাজ যদি স্থিতাবস্থায় আবদ্ধ থেকে যায়, সাহিত্য নিজে নিজে উড়তে পারে না তার আগে। যদি তেমন সমাজে সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করে তার মানে হল, সে সমাজ দ্বারা এ (সাহিত্য) সমর্থিত, এই (সাহিত্য) বিপ্লবের দিকে পিছন ঘুরে গেছে। এর একমাত্র পরিণাম, খানিকটা বেশি বেশি করে পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হওয়া নয়তো বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় ছাপা হবার সুযোগ মেলা।

আমার বিশ্বাসে সংগ্রাম করা ঠিক। জনগণ অত্যাচারিত হলে কেন সংগ্রাম করবে না? তবে যেহেতু এ সংগ্রামকে সম্মানিত ভদ্রলোকেরা (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সংগঠন ক্রিসেণ্ট মুন সোসাইটির সদস্যরা) ভয় পান, সেহেতু একে তাঁরা "র‍্যাডিক্যাল" বলে বরবাদ করেন ও নালিশ জানান, যে দুনিয়া জুড়ে মানুষ মানুষকে ভালবাসার কথা,—তা তারা বাসতো, যদি না এখন এক দল বদ চরিত্রের লোক তাদেরকে নষ্ট করত। যারা ভাল খায় তারা হয়তো উপবাসীদের ভালবাসতে পারে, কিন্তু উপোসীরা কখনো

ভাল খায় যারা তাদেরকে ভালবাসে না।" (সাহিত্য ও বিপ্লব : ১৯২৮)

(২) এমন কি যে লেখকরা শুধুই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেন। তাঁরা যদি (সমাজ দেহের) অভিশাপগুলি পরিষ্কার না দেখেন। সমস্যার মূল কোথায় তা (পরিষ্কার) না বোঝেন, তাহলে পরে বিপ্লবের ক্ষতিই করবেন। দুঃখের কথা হল বিপ্লবী লেখক ও সমালোচক সহ এখনকার অনেক লেখকই এ কাজে ব্যর্থ, কিংবা সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার স্বরূপ আবিষ্কার করার, বিশেষ করে শত্রুর স্বরূপ আবিষ্কারের সাহসই নেই তাঁদের।

"একটা উদাহরণ যা মনে আসছে, দেওয়া যাক। "লেনিন ইউথ" পত্রিকায় আধুনিক চীনা সাহিত্য বিষয়ে এক প্রবন্ধ বলল, যে চীনা লেখকদের তিনটি শিবিরে ভাগ করা যায়। প্রথমে প্রলেতারিয়েতের সাহিত্যগোষ্ঠী হিসেবে "ক্রিয়েশন সোসাইটি" বিষয়ে থাকল সুদীর্ঘ আলোচনা। তারপর পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি "ট্যাটলার" গোষ্ঠী সংক্ষেপে আলোচিত হল। তারপর আরো সংক্ষেপে, এক পাতারও কম জায়গায় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি "ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটি" আলোচিত হল। যাদের সে সর্বাধিক ঘৃণা করে, তাদের বিষয়ে তরুণ সমালোচকটির বলার কথা সবচেয়ে কম তা তো দেখাই গেল। অন্যভাবে বলা চলে সে ওদেরকে নিরীক্ষণ ও অনুশীলন করে নি।" (শাংহাইয়ের সাহিত্যের দিকে এক নজর : ১৯৩১)।

(৩) "আজকাল কোন কোন লেখক তাঁদের সংলাপে অপ্রয়োজনে গালিগালাজ ও দিব্যি গালার মশলা মেশান। যেন তাতেই সেটি প্রলেতারীয় হল। যত অপশব্দ, ততই তা প্রলেতারীয়। সত্যি বলতে কি যতবার মুখ খোলেন ততবার খিস্তি করেন খুব কম সংখ্যক শালীন কৃষক ও শ্রমিক। শাংহাইয়ের মস্তানদের ধরণধারণ তাঁদের ওপর আরোপ করা লেখকদের উচিত নয়। যদি খিস্তিবাজ শ্রমিক থাকেন, তবে (খিস্তি করা) তাঁদের একটি বদভ্যাস। লেখকরা তাঁদের শুধরে

দিন কিন্তু কোন কারণেই যেন (খিস্তির) প্রচার না করেন। নইলে ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সমাজে আমরা এ-ওর পূর্বপুরুষকে গাল পাড়ব।... শত্রুকে মোক্ষম ঘা হানবার জন্যে সঠিক মুহূর্তটির অপেক্ষা করাই ভাল। সর্বদা হইহল্লা জীইয়ে রাখা হল "রোমান্স অফ দি থ্রী কিংডম্‌স" বইয়ের আচরিত কৌশল আর শত্রুর বাপ-মাকে গাল পেড়ে নিজেকে বিজয়ী ভেবে জাঁক করা হল নিছক আকিউবাদ।......... জার্মানীর প্রলেতারীয় বিপ্লব বিফল হয়, কিন্তু তখন গণহত্যা হয়নি। রাশিয়াতে ওরা তো জারের প্রাসাদও পোড়ায়নি। তবু আমাদের লেখকরা বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের রাক্ষস রূপে চিত্রিত করেন। এটি আমার কাছে খুবই কুরুচিপূর্ণ।......আমি এ কথা বলি না যে আমরা দুশমনের সামনে সহাস্যে নতি জানাব। আমি শুধু বলি যে লড়াকু লেখকরা মন দিন যুক্তি প্রদর্শণে।......তাঁরা পরিহাস বা ক্রুদ্ধ নস্যাৎ-জ্ঞাপনে বিরত হোন, স্ব-আবেগকে প্রকাশ করুন সাহিত্যে, নিজেদের ছোট না করে, পাঠককে বিতৃষ্ণ না করে। বিতর্কের মজাই তো এখানে। (গোলাগুলি ও হুমকি লড়াই নয়: ১৯৩২)।

(৪) বিগত তিন বছরে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক বিতর্ক খুব কমই হয়েছে। সেই সব "তাত্ত্বিক" যাঁরা সেনাপতির তরবারি দ্বারা প্রতিরক্ষিত,—যাঁরা নিজেদের বলেন "বামপন্থী" এবং মার্ক্সবাদের মধ্যে শিল্পের স্বাধীনতার সপক্ষে, লেনিনবাদের মধ্যে "কম্যুনিস্ট দস্যুদের বিনাশের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পান, তাঁরা ছাড়া আর কেউ বলতে গেলে মুখ খুলতে পারছে না। "শিল্পের জন্য শিল্প" গোষ্ঠীর লেখকরা এখনো "স্বাধীন" আছেন বটে, কারণ কেউ এ সংশয় পোষণ করে না যে তাঁরা রুবল নিচ্ছেন। কিন্তু "তৃতীয় পর্যায়ের" সদস্যরা, যাঁরা "প্রাণপণে সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন", তাঁরা এই ভীষণ পূর্বাশঙ্কা এড়াতে পারছেন না যে বামপন্থীরা তাঁদেরকে "বুর্জোয়া শ্রেণীর ঘৃণ্য চাটুকার" বলবে। "(তৃতীয় পর্যায় প্রসঙ্গে: ১৯৩২।"

এখানে "তাত্ত্বিক"রা হলেন হু কিউয়ান ও আরো কিছু ট্রটস্কিপন্থী।

স্থ মার্ক্সবাদী সেজে শিল্পে-সাহিত্যে স্বাধীনতার সপক্ষে মুখে বলতেন এবং কার্যকালে ট্রটস্কিপন্থীদের সঙ্গে মিলে চীনা শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজকে "দস্যুদল" বলতেন। "তৃতীয় পর্যায়" বোঝাচ্ছে সু ওয়েনকে। বামপন্থী লেখকরা শ্রমিক-কৃষকের জন্য যে "চিত্রে কাহিনী" ছাপতেন তিনি তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'যাঁরা প্রাণপণে সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরে আছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা এর বিরোধিতা করবেন।")

দশ বছর খানেক বয়সের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের এক মিছিলের উপর শিক্ষাবিভাগীয় কমিশনার ফৌজ লেলিয়ে দিয়ে মোটরগাড়ি চালিয়ে দেন তাদের উপর। দুটি শিশু মারা যায় ও বহুজন আহত হয়। সে বিষয়ে লু শুন বলছেন, (৫) "প্রতিপক্ষ যদি বাধা দানে সক্ষম হত তাহলে মোটরগাড়িগুলি বেকায়দায় পড়ত ও আক্রমণকারীকে অত বীর মনে হত না। সবচেয়ে ভাল দুর্বল প্রতিপক্ষ বাছাই। গুণ্ডারা ত্রাসিত করে কৃষকদের, বিদেশীরা পেটায় চীনাদের, শিক্ষা-কমিশনাররা আক্রমণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের—সাহসী পুরুষ এরা, দুশমনকে পরাজিত করতে যথেষ্ট সক্ষম।

"...সেদিন আর নেই যখন "শিশুদের খুন করা" অপরাধ বলে গণ্য হত। আমার মনে হয় তেমন দিন আসতে দেরি নেই যখন তামাশা করার জন্য আমরা কচি শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বর্শার ফলকে বিঁধব।" (আক্রমণ: ১৯৩৩)

পরবর্তী পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে লিখিত। ১৯৩৬ সালের ১৯শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয় এবং ১৭ই অক্টোবর তিনি "শাং তাইয়ান প্রসঙ্গে কিছু কথা" নামে যে বড় প্রবন্ধ শেষ করেছেন তার কোথাও ক্ষয় রোগীর যন্ত্রণাদায়ক আসন্ন মৃত্যুর ম্লানিমা নেই। তাতে বলছেন সকালে উঠে কাগজ দেখে তাঁর মনে হল, "চীনা প্রজাতন্ত্রের আজ তবে পঁচিশ বছর পূর্ণ হল! এক শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ ধরে চীনা প্রজাতন্ত্র আছে! চমৎকার! তার মানে কি আশ্চর্য দ্রুত সময় উড়ে বেরিয়ে যায়।" এ বিস্ময়বোধ করার সময়ে

তিনি মাথায় হাত বোলাচ্ছিলেন। মাথায় হাত বুলানোর বিশেষ অর্থ হল, লু শুন পঁচিশ বছর আগেই তাঁর বেণী কেটে ফেলেন এবং হাত বুলিয়ে সেটা পরখ করার ব্যাপারটা পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। প্রবন্ধটিতে বহু স্মৃতির খণ্ড চিত্র, কোমল প্রসন্নতা আছে। বড় আনন্দে তিনি বেঁচেছিলেন ও বড় আনন্দ ধরে রেখেই চলে যাচ্ছেন, এমনই মনে হয়। এ প্রবন্ধটি নিশ্চয় খুব মর্মভেদী নয়, কিন্তু তখনো যে তিনি লিখেছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

লু শুন চেতনার উন্মেষ থেকে মৃত্যু অবধি চীনের মাটিতে ঝড়ঝঞ্ঝাই দেখে গেলেন। এ সব প্রবন্ধ লেখার সময়কালে জাপানীরা উত্তরপূর্ব অঞ্চল থেকে দক্ষিণে পিকিং ও তিয়েনৎসিনে আক্রমণ চালায়। ১৭।৪।১৯৩৪-এ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে উদ্ধত ঘোষণা করে যে চীন তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলভুক্ত। ১৯৩৫ সালে এক চুক্তিতে কুওমিণ্টাং সরকার হোপেই ও চাহার প্রদেশে চীনের সার্বভৌম অধিকার জাপানকে লিখে দেয়। সে বছর নভেম্বরে অন্তর্মংগোলিয়া দখল করে জাপান এক ক্রীড়নক স্বয়ংশাসন সরকার সেখানে স্থাপন করে। ১৯৩৬ সালে জাপান উত্তর চীন সেনা কেন্দ্র স্থাপন করে পিকিং-লিয়াওনিং রেলপথে ফৌজ, গুপ্তচর ও চোরাই মাল চীনের সর্বত্র পাঠাতে থাকে। এ হল সমগ্র চীন দখলের তোড়জোড়।

আর দালাল কুওমিণ্টাং প্রতিরোধ না করার নীতি চালাতে থাকে। বেইমানি করে দেশকে তুলে দেয় জাপানের হাতে, দেশপ্রেমী আন্দোলন দমনে নেমে পড়ে ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লবী ঘাঁটি দখলে পঞ্চম আক্রমণ চালায়। ১৯৩৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে লাল ফৌজ সুরু করে বিখ্যাত লং মার্চ উত্তর চীনে গিয়ে জাপানকে যুদ্ধে প্রতিহত করার জন্য।

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৩৫ সালের আগস্টে প্রকাশ করে "জাপানকে প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন" এবং সে বছরই নভেম্বরে প্রকাশ করে "জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে

বাঁচাবার জন্যে দশ দফা কার্যসূচী।" তাতে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন, গৃহযুদ্ধের অবসান ও জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তিতে প্রতিরোধের কথা বলা হয়।

এতে সমগ্র দেশ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ব্যাপক সমর্থন জানায়, সাহিত্যজগত তো বটেই। ২৮।১২।১৯৩৫ তারিখে শাংহাইয়ের সংস্কৃতি জগৎ "জাতীয় পুনরুদ্ধার কল্পে সামাজিক সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৬ সালের মে মাসে "জাতীয় পুনরুদ্ধার সর্ব চীন সম্মেলন" স্থাপিত হয় এবং দেশের সর্বত্র এক হাজারেরও বেশি দেশাত্মবোধক পত্রপত্রিকা বেরোয়। তখন শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনে মূল কথা হয় শ্রেণী-দল নির্বিশেষে সকল বয়সের লেখক-শিল্পীর ঐক্য, বাদ থাকে শুধু দুশমনের সহযোগীরা। জাপানকে প্রতিরোধ কল্পে শিল্পী-সাহিত্যিকের যুক্তফ্রন্ট করা স্থির হয়। অক্টোবরের গোড়ায় চীনের লেখক-শিল্পীরা এই মর্মে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। সংস্কৃতি জগতের সকল প্রধানরাই এতে সই করলেন। ফলে জাপানবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি স্থাপিত হল।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ লু শুন শ্বেতসন্ত্রাসের রঙ্গভূমি শাংহাইয়ে ছিলেন। ক্ষয় রোগে দেহ জীর্ণ তবু তিনি লড়ে চলেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রগতিশীল লেখকদের, চিয়াং কাইশেক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল কাজগুলিকে উন্মোচন করছেন ও আক্রমণ করছেন নির্ভয়ে পরাজিত করছেন সংস্কৃতিফ্রন্টের ওপর চিয়াং সরকারের আক্রমণ। এ সময়েই তিনি অটুট শপথে সাহিত্যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়ছেন। লিন য়ুটাং প্রমুখ চাটুকার লেখকদের কঠোর সমালোচনায় নির্মম হচ্ছেন, আক্রমণ করছেন সে সব লেখককে যারা দেশের এই রক্তাক্ত সময়ে মিং রাজত্বের শেষ দিকের ধারায় রম্যরচনা লিখছে, বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে সংস্কৃতি জগতের রাজাবাদশা সেজে থাকছে। ইয়াং কুনরেন, ৎসেং জিনকে, এদের মতো "বিপ্লবের ফেরিঅলা" যারা, তাদের মুখোশও খুলে দিচ্ছেন।

লু্ শুন, দেশের এ সংকট সময়ে নিজের বিপ্লবী অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছেন যেমন, তেমনই লিখিত সাক্ষ্য রাখছেন জাপানী আগ্রাসন প্রতিরোধে যুদ্ধের প্রাক্কালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি সমর্থনের।

"ট্রটস্কিপন্থীদের এক চিঠির জবাবে" (১৯৩৬) প্রবন্ধে তিনি বললেন. "কমরেড হিসেবে তাঁদের পেতে আমি গর্ব বোধ করি যাঁরা কাজের কাজ করছেন। শক্ত মাটিতে পা ফেলে চলছেন, চীনাদের বর্তমান পুরুষের টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করছেন. রক্ত দিচ্ছেন।" মাও ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক ও কৃষকের লাল ফৌজের কথা বলেছেন তিনি এখানে।

এই পর্যায়ের প্রবন্ধে লু্ শুন চীনা বিপ্লবী সাহিত্য ক্ষেত্রে মহান ধ্যানধারণা যোগ করে গেছেন। কিছু শিক্ষিত লোক জনগণকে নির্বোধ মনে করে। লু্ শুন তো তা মনে করেন না। তিনি বললেন, "ওরা জ্ঞান চায়, নতুন জ্ঞান। ওরা অনুশীলন করতে চায়, নতুন জিনিস গ্রহণ করতে পারে। ভাষার মধ্যে যদি শুধুই থাকে নতুন শব্দ ও নতুন বাক্য গঠনরীতি, তাহলে অবশ্য ওরা বুঝবে না। কিন্তু যা ওদের দরকার, তা যদি ধীরে ধীরে দেওয়া যায়, ওরা গ্রহণে সক্ষম হবে। যে সব পণ্ডিতরা প্রাক গঠিত ধ্যানধারণা নিয়ে বসে আছেন তাঁদের চেয়ে এদের পরিপাক ক্ষমতা হয়তো জোরাল।" (লেখালেখি বিষয়ে এক সাধারণ লোকের মন্তব্য: ১৯৩৪)। লু্ শুন মনে করতেন শিক্ষণীয় বিষয়কে আগে শিক্ষার্থীপ্রিয় করতে হবে আর ক্রমে তার মান উন্নত করতে হবে।

এই নতুন সংস্কৃতি তো প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ও বিপ্লবের ফসল। তিনি বলেছেন নয়া শিল্প ও সংস্কৃতি বর্জন করুক যা সামন্তবাদী ও পশ্চাৎপদ। প্রাচীন শিল্প-সাহিত্য থেকে তা বিচ্ছিন্ন হবে না এবং যা নেবার মত সেটুকু নেবে। যা জনগণের কাছাকাছি, বিপ্লবের কাছাকাছি, তা গ্রহণ করবে।

দেশ, জনগণ, বিপ্লব, নতুন শিল্প-সাহিত্য, চীনের পক্ষে যা যা

প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের অতন্দ্র প্রহরী ও নতুন চীন সৃজনের চিরযুধ্যমান সৈনিক লু শুন ১৯৩৬ সালের ১৯শে অক্টোবর পরলোক গমন করলেন কিন্তু চীন ব্যতীতও সকল আধাঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশের সৎ সংস্কৃতিকর্মীর কাছে তিনি আজও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেন না যে সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল, সেগুলি সে সব দেশে আজও রাজত্ব করছে। কুসংস্কার, শাসক শ্রেণীর দালাল শিল্পী-সাহিত্যিক, বাস্তব বর্জিত ভাববাদী বা ছিন্নমূল অপকারী সংস্কৃতিচেতনা, জনগণের প্রতি উন্নাসিকতায় বিমুখ প্রগতিশীল সংস্কৃতি-পাণ্ডার দল, নারীর প্রতি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-দৃষ্টিভঙ্গি, বেনামে দাসপ্রথা, শিশুকে ব্যবসায় পণ্যে উৎপাদক রূপে ব্যবহার, জনগণের ওপর শোষণ ও অবিচার, সবই চোখ মেললে দেখা যাবে। সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতি দাসানুগত্য তেমন সব দেশে অতি বাস্তব সত্য। যে যে কারণে তিনি লু শুন হয়েছিলেন, সে কারণগুলি মানচিত্রে যতদিন সজীব থাকবে, ততদিন লু শুনকে বিস্মৃত হওয়া পৃথিবীর দারিদ্র্য ও শোষণপীড়িত দেশগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। বরঞ্চ তাঁকে অনুশীলন করে তাঁর থেকে লব্ধ শিক্ষা স্বদেশের মাটিতে প্রয়োগ করলেই চেতনার মুক্তি ঘটা তবু সম্ভব। সংস্কৃতিকর্মী নিজেকে অক্লান্ত সৈনিক বলে নিরন্তর কর্মে নিজের ভূমিকাকে যথার্থ তাৎপর্য দিলে তবেই "লু শুন" নামের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি থেকে কিছু কিছু তুলে দেয়া গেল। লু শুনের বিষয়ে সব কথা তাঁর নিজের লেখাতেই ধরা আছে।

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীমতী কিন লিশাই নামে এক মহিলা দুই ছেলে ও এক মেয়ে সহ আত্মহত্যা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি সাংহাই থেকে যান ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ছিল বলে। এঁর শ্বশুর এঁকে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতে হুকুম দিয়ে অনেকগুলি কড়া চিঠি লেখেন। ফলে আতঙ্কে মনোবল হারিয়ে মহিলা আত্মহত্যা করেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন মন্তব্যে মহিলার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েও তাঁর

দুর্বলতাকে নিন্দা করা হয়। এ প্রসঙ্গে লু শুন তেমন কোন আলগা মন্তব্য করেন নি। ঘটনাটি তাঁর কাছে চীনা সমাজে নারীর অবস্থান কি শোচনীয় সেই সত্যই তুলে ধরে।

(১) "প্রগতির জন্য, অগ্রসরণের জন্য মানুষের নিশ্চয় বাঁচা উচিত। ভবিষ্যতে সকল যন্ত্রণাকে নির্মূল করার জন্য (এখন) তাদের যন্ত্রণা-ভোগে আপত্তি করা উচিত নয়। যদি সংগ্রাম করে তাহলে সংস্কার আনার জন্যই করা উচিত। যারা আত্মহননের জন্য অপরকে দোষ দেয়, তাদের, ওই মহিলাকে দায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে যে পরিস্থিতি তাঁকে দিয়ে আত্মহত্যা করাল, সেটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো ও আক্রমণ করাও উচিত। অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে তারা যদি একটি কথাও না বলে, একটি তীরও না ছোঁড়ে, শুধুই গাল পাড়ে যে "দুর্বল" তাকেই,—তাহলে তাদের মনোভাব যত ভালই হোক না কেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আর চুপ করে থাকতে পারছি না,—যে তারা হল খুনীদের সহযোগী।" (মিসেস কিন লিশাই-এর কেস : ১৯৩৪)

(২) "স্বীকার করতে হবে যে কনফুসিয়াস রাজ্য শাসনের জন্য উল্লেখযোগ্য সব নীতি তৈরি করেছিলেন কিন্তু কর্তারা জনসাধারণকে শাসন করবেন বলেই ওগুলো ভাবা হয়। ওগুলোর মধ্যে জনগণের পাবার কিছু ছিল না।···আমার মনে হয় এই বলাই সব চেয়ে শোভন হবে যে তাঁর জনগণ বলে কোন অনুভূতিই ছিল না। যাঁর তাদের বিষয়ে কোন অনুভূতি নেই, সে ঋষির বিষয়ে তাদের কোন মায়ামমতা থাকবে না এ তো স্বাভাবিক। যখন ইচ্ছে, একবার ছেঁড়া পোশাকে খালি পায়ে কু ফু-র কনফুসিয়াস মন্দিরে বলি-গৃহে ঢুকে পড়ে দেখো, বিলাসবহুল সিনেমা হল বা সাংহাইয়ে ট্রামের প্রথম শ্রেণীর কোচ থেকে যেমন করে বের করে দেয়, তেমনি করেই হয়তো বের করে দেবে। কেননা সবাই জানে যে এগুলি হল বড়লোক ভদ্রলোকের জন্য। অজ্ঞ জনগণ এতটা অজ্ঞ নয় যে সে কথা বোঝে না।"

(আধুনিক চীনে কনফুসিয়াস : ১৯৩৫)

(৩) "কোন কোন উক্তি, যা প্রাচীন কালে যথার্থ ছিল, এখন মিথ্যে হয়ে গেছে। মনে হয় কোন পাশ্চাত্যবাসী বলেছিলেন, এ দুনিয়ায় গরিবের রোদ, বাতাস ও জল ছাড়া কিছুই নেই। সাংহাই বাসিন্দাদের বেলা কিন্তু এটি সত্যি নয়। যারা হাত ও মাথা খাটিয়ে খাটে, তারা সারাদিন ঘরে বন্ধ, সে ঘরে রোদ বা বাতাস নেই। যাদের কলের জল নেবার ক্ষমতা নেই তারা বিশুদ্ধ জলও খেতে পায় না। কাগজে প্রায়ই লেখে, "আবহাওয়া অস্বাভাবিক ছিল, মহামারী দেখা দিয়েছে।" আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা নয়। স্বর্গের কোন বলার বা করার ক্ষমতা নেই ও বিপদের অভিশাপ (স্বর্গ) নীরবে সহ্য করতে বাধ্য।"

(খাদ্যের জন্য স্বর্গের ওপর আস্থা রাখো : ১৯৩৫)

(৪) "লেখক-শিল্পী সম্মেলন বিষয়ে আমার বক্তব্য হল, আমার বিবেচনায় এটি লেখকদের সেই সংগঠন, যাঁরা জাপানকে প্রতিরোধের সপক্ষে এবং যদিও এতে শু মাওইয়ং—এর মত সদস্য আছেন, নতুন লোকও আছেন কিছু। কিন্তু এ কথা যেন আমরা কখনো না ধরে নিই যে এ সম্মেলন গঠিত হয়েছে বলে সাহিত্য-শিল্প জগতে যুক্তফ্রন্টও গঠিত হয়েছে। একেবারেই তা নয়। আমরা এখনো বিভিন্ন গোষ্ঠীর সব লেখক-শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারিনি। তার কারণ এখনো লেখক-শিল্পী সংস্থার গায়ে একপেশেমি ও গুণ্ডাবাজির গন্ধ লেগে আছে। অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও এর নিয়মাবলী ও সদস্য হবার যোগ্যতাবলী যথেষ্ট কড়া। প্রতি সদস্যকে প্রথমে এক ডলার ও বছরে দুই ডলার করে চাঁদা দিতে হবে। তাতেই দেখা যাচ্ছে যে জাপানকে প্রতিরোধের এক "গণ" সংগঠনের বদলে এটি উপরমহলের ব্যাপার।"

(শু মাওইয়ংকে জবাব দান ও যুক্তফ্রন্ট প্রসঙ্গে : ১৯৩৬)

(৫) "যুক্তফ্রন্টের কথা প্রস্তাব হওয়া থেকে যে সব বিপ্লবী লেখক

শত্রুশিবিরে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসেছেন এবং যুক্তফ্রণ্টে তাঁরাই "পথিকৃৎ" এমন ভাণ করছেন। তাঁদের সে নিন্দনীয় উৎকোচ গ্রহণ, শত্রুর সঙ্গে মাখামাখি, সেগুলিকে এখন বলা হচ্ছে প্রগতিশীল ও মহান কাজকর্ম।"

(মধ্য গ্রীষ্মে কালির আঁকিবুকি : ১৯৩৬)

(৬) (ক) লু শুন একবার অন্তিম ইচ্ছাপত্র লিখবেন ভাবলেন : কারো কাছে আমার অন্ত্যেষ্টির জন্য এক সেণ্টও নিওনা। পুরনো বন্ধুদের বেলা এ কথা প্রযোজ্য নয়।

(খ) ঝটপট সেরে ফেলো সব, আমাকে কবর দিও, বৎস্।

(গ) স্মৃতি রক্ষা করার কোন প্রয়াস কোর না।

(ঘ) আমাকে ভুলে যেও, নিজেদের মত করে বেঁচ, যদি না করো, তবে তোমরা মূর্খ।

(ঙ) বাচ্চা যখন বড় হবে, যদি ওর কোন প্রতিভা না থাকে, বেঁচে থাকার মত রুজিরোজগারের জন্য ও যেন ছোটখাট একটা চাকরি নেয়। কোনমতেই ওকে নামে মাত্র লেখক বা শিল্পী হতে দিও না।

(চ) অন্যদের প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দিও না।

(ছ) যারা অন্যদের ক্ষতি করে, প্রতিশোধের বিরোধিতা করে ও সহিষ্ণুতার সপক্ষে বলে, তাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব রেখনা।"

(মৃত্যু : ১৯৩৬)

॥ সমাপ্ত ॥